আমাদের ছুটি - ১৯শ সংখ্যা

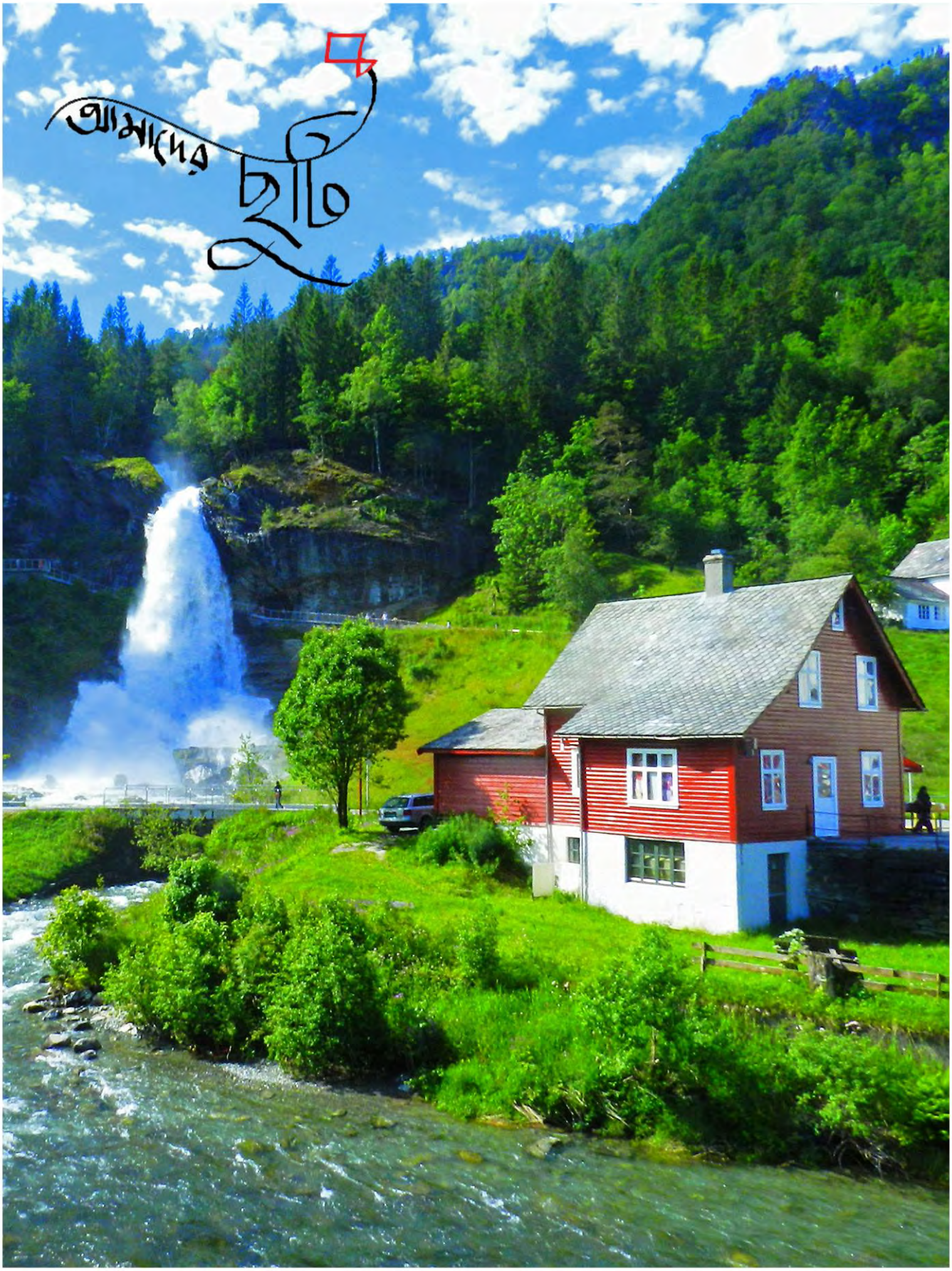

স্টেইনডালফসেন জলপ্রপাত, নরওয়ে - আলোকচিত্রী- শ্রী কণাদ চৌধুরী

আমাদের ছুটি - ১৯শ সংখ্যা

~ ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২৩ ~

কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে - পাঁচটা বছর কেটে গেল! ২০১১ সালের ১২ মে 'আমাদের ছুটি'-র পথচলা শুরু হয়েছিল। তার নির্মাণ পর্ব চলেছিল আরও দুবছর আগে থেকেই, সেই ২০০৯ সাল থেকে ছবি, তথ্য, লেখা সব জড়ো করার পালা। গত কয়েক বছরে বদলে বদলে গেছে সহযোগিতার হাত। এই মুহূর্তে 'আমাদের ছুটি'-র সঙ্গে খুব সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন - সহ সম্পাদক সুদীপ্ত দত্ত আর আমাদের সকলের প্রিয় সুবীরদা ও বাপ্পাদা - অর্থাৎ সুবীর কুমার রায় এবং তপন পাল।

প্রায় কোনও প্রচার না থাকলেও 'আমাদের ছুটি' যে বেশ কিছু পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে তা শুধু গুগল অ্যানালিটিকসের তথ্য থেকে নয়, নানা টুকরো টুকরো প্রতিক্রিয়াতেও বুঝতে পারি। ওয়েবসাইটে মতামতের পাতায়, ফেসবুকে, ই-মেলে পত্রিকাটিকে ভালোলাগার অনুভূতির কথা নিয়মিতই কেউ না কেউ জানান। একাধিক পাঠক এমনও জানিয়েছেন যে, বিনামূল্যেই এত ভালো সব লেখা পাচ্ছেন যে প্রিন্টেড ভ্রমণ পত্রিকা না কিনলেও চলে! 'আমাদের ছুটি'-র পাতাতেই লেখালেখি শুরু করে এখন নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন কেউকেউ। আবার কোনও পাঠক পত্রিকা প্রকাশ কেন এত দেরি করে হয় তাই নিয়ে ক্ষোভও জানিয়েছেন।
পাঠকদের কাছে আবারও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, বছরে চারটের বেশি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। তবে লেখার ধরণে নানা বৈচিত্র্য এনে গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনির বাইরে অন্যস্বাদ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা। এই সংখ্যায় স্মৃতির ভ্রমণের পাতায় স্বনামধন্য লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্রফটের দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনির একটি টুকরো অনুবাদে দেওয়া হল। আগামীদিনে এমন আরও বিদেশি পুরোনো ভ্রমণকাহিনির অনুবাদ পাঠকের দরবারে হাজির করবার ইচ্ছে রইল।
জনপ্রিয়তার স্বাভাবিকভাবেই কিছু মন্দ দিকও থাকে। তার ভুক্তভোগী আমরাও। 'উত্তরের সারাদিন' নামে উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক একটি সংবাদপত্র গত বেশ কয়েকমাস ধরে নিয়মিতভাবেই কোনও অনুমতি বা স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই 'আমাদের ছুটি' থেকে লেখা ও তথ্য তাঁদের কাগজে পুনঃপ্রকাশ করছিলেন। একই কাজ করছিল বাংলাদেশের একটি নিউজ পোর্টাল বিসিসি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডট কম যারা কিনা নিজেদের 'সততার প্রতীক' ঘোষণা করে! এছাড়াও দুটো-একটা লেখা বিচ্ছিন্নভাবে অন্য দু-একটা ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে তা নজরে এসেছে আমাদের। যথাবিধি চিঠি পাঠানোর পর চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু খোলাখুলি স্বীকার করতে হয়ত তাঁদের সকলেরই 'সততায়' বেঁধেছে।

'আমাদের ছুটি' তার নিজের যোগ্যতায় আর আপনাদের আগ্রহে আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। ভ্রমণ ও তার কাহিনি লেখার মারফত সারা পৃথিবীর বাঙালির মধ্যে যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায়, পাঁচ বছর আগে দেখা এই স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে। যে যত্নে প্রতিটি সংখ্যার নির্মাণ হয় তা কি কয়েকটা লেখা আর ছবি টুকে প্রকাশ করে দিয়ে নিজেদের সততার প্রতীক বলে জারি করলেই হয়ে যায়? তার গায়ে যে ভালোবাসা আর মায়া মাখানো থাকে তা তো চুরি করা যায় না। অনেক কিছুই হয়না, হওয়া যায় না, অর্জন করতে হয়। অনেক কিছুই হয়না, নির্মাণ করতে হয়।
এই পাঁচ বছরে 'আমাদের ছুটি' আমার নিজের কাছে তেমনই এক অর্জন, এক নির্মাণ। পাঠকের কাছে তা কী সেটা তাঁরাই জানাবেন।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

সম্পাদকের পত্র - প্রমদাচরণ সেন

নরওয়ের দিনগুলি - মেরি ওলস্টোনক্রাফট

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র অষ্টম পর্ব 'যমুনোত্রীর পথে - গোমুখ থেকে উত্তরকাশী'

~ আরশিনগর ~

অতি সাধারণ এক ভ্রমণকাহিনি - অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

দাঁতনে - বুদ্ধদন্তের খোঁজে - তপন পাল

আমাদের ছুটি - ১৯শ সংখ্যা

ইটাচুনার রাজকাহিনি - সঞ্চিতা পাল

~ সব পেয়েছির দেশ ~

বিষ্ণুর উপত্যকায় - অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ দেখা ভোজপুর - অতীন চক্রবর্তী

ভারতের হৃদয়ের খোঁজে- সৌমিত্র বিশ্বাস

~ ভুবনডাঙা ~

নরওয়ের বন্দর শহরে - কণাদ চৌধুরী

অ্যাজটেকদের দেশে - শ্রাবণী ব্যানার্জী

বন্য আফ্রিকায় - অরীন্দ্র দে

~ শেষ পাতা ~

ঈশ্বরের চিত্রপট তাকদায় - উদয়ন লাহিড়ি

পূবারের সোনালি তটে - অনুভব ঘোষ

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

-->

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য মাঝেমধ্যে পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[শিশু-কিশোরদের জন্য প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা 'সখা'-র প্রতিষ্ঠাতা প্রমদাচরণ সেন ১৮৫৯ সালের ১৮ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি কৈশোর থেকেই যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে। সংস্কৃত ও ইংরেজির পাশাপাশি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন তিনি। খুব অল্প বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথমে নাকিপুর এন্ট্রান্স স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও পরে কলকাতার সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। লেখক হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। 'মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী', 'চিন্তাশতক' ও 'সাথী' নামে তিনটি বই লেখেন। তাঁর লেখা 'ভীমের কপাল' (১৮৮৩) বাংলায় প্রথম কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস।সিটি স্কুলে শিক্ষকতার সময়ই শিশুদের জন্য পত্রিকা চালু করার পরিকল্পনা করেন । ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সখা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকা প্রকাশনার জন্য অসম্ভব পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তবু অজানাকে জানার স্বপ্ন পূরণের আশায় তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করেন। অবশেষে দাদা ও বন্ধুদের চেষ্টায় অর্থসঙ্কুলান হলেও বিলেতে রওনা দেওয়ার ঠিক আগেই ক্ষয়রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দয়ালু প্রমদাচরণ রুগ্ন অবস্থাতেও শিশু,গরীব ও অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে বছরখানেক রোগভোগের পর ২১ জুন ১৮৮৫ সালে খুলনায় মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রমদাচরণ মারা যান।
তাঁর মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল বিভিন্নজনের সম্পাদনায় 'সখা' প্রকাশিত হতে থাকে এবং বাংলা শিশু সাহিত্যে নিজের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যায়। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যেও 'সখা' পত্রিকার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে প্রমদাচরণের লেখা একটিমাত্র ভ্রমণকাহিনিই 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পত্রাকারে।]

সম্পাদকের পত্র

প্রমদাচরণ সেন

তোমাদের সখা-সম্পাদক কিছুকালের জন্য বিদেশে গিয়াছেন; তিনি সেখান হইতে তোমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলাম।

প্রথম পত্র

আমার প্রিয় বালক-বালিকাগণ!
আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, এখন যেখানে আছি সেখানে ও তাহার চারিদিকে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিতে পাইতেছি তাহার কথা তোমাদিগকে বলি। পরমেশ্বর কত কত আশ্চর্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যাহারা দেশ বিদেশে বেড়ায় তাহা যত ভাল বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে? এই জন্য যাঁরা পাহাড় পর্বত, নদী সাগর, সরোবর, হ্রদ, অগ্নির গিরি এবং বরফের গিরি, লবণের খণি এবং কয়লার খণি, প্রভৃতি দেখিয়া বেড়ান, তাহাদিগকে আমার বড়ই 'হিংসা' হয়। অনেক দিন হইতে মনে মনে ইচ্ছা ছিল দেশে দেশে ঘুরিব, কিন্তু এতদিন সে ইচ্ছা কাজে আসে নাই, এখন একটু একটু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া এইখানে আসিয়াছি, কিন্তু আর যে বেশী দূর যাইতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। ইহাই আমার বড় দুঃখের কারণ। তোমরা বোধ হয় জান যে, যে ব্যক্তি রসগোল্লার স্বাদ একবার পাইয়াছে, সে সর্বদাই তাহা খাইতে চায়, আর জন্মেও ভুলে না; আমারও তাই হইয়াছে। এইখানে আসিয়া চারিদিকের সুন্দর শোভা ও চমৎকার শ্রী দেখিয়া আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, এখন ক্রমাগত এইরূপ দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, কাজে আটকাইতেছে। তাই আমার কষ্ট। তোমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, সেই সময় তোমার চারিদিকে ভাল ভাল রসগোল্লা সাজাইয়া যদি তোমার হাত পা কেহ বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তাহাই হইয়াছে। আমি চারিদিকের সুন্দর শোভার বাহার বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ ছুটিয়া গিয়া সেই শোভার নিকট বসিতে পারিতেছি না, এই আমার কষ্টের কারণ।
দুর্গাপূজার ছুটির সময় আমি কলকাতা হইতে বাহির হই। এই আমার প্রথম পশ্চিমদিকে যাত্রা। তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমে থাকে, তারা হয়ত মনে মনে হাসিবে, কিন্তু আমি পশ্চিমে বর্ধমানের এদিকে আর আসি নাই, কাজেই যতটুকু আসিয়াছি, তাহাতেই মনে হইতেছে ভয়ানক পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি। এই স্থানটীর জলবায়ু খুব ভাল, চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড়, দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমি যে বাড়ীতে থাকি তাহার বারান্দা এবং উঠান হইতে গাঢ় ঘনমেঘের ন্যায় পরেশনাথ পাহাড় দেখা যায়। এইখানে আসিয়া প্রথমেই দুটী বিষয় আমার চক্ষে লাগিল; প্রথমতঃ থাকিবার স্থান, দ্বিতীয়তঃ খাদ্য দ্রব্য। এখানে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই খোলার চাল, কোটাবাড়ী পাওয়া শক্ত—এপর্য্যন্ত মোটে তিনটী কোটাবাড়ী দেখিয়াছি, - একটা জমীদারের বাড়ী আর দুটো দোকান। খোলার বাড়ী গুলিতে জানালা প্রায় নাই, প্রথমে মনে হইল বুঝি বড় শীত বলিয়া জানালা রাখেনা, কিন্তু শেষে শুনিলাম, তাহা নহে। "সিন্ধুক্কা মাফিক ঘর" অর্থাৎ সিন্দুকের মত চারিদিকে আটা সাটা ঘরই এখানকার লোকের মনের মত। জানালা রাখিতে বলিলে, তাহারা চটিয়া যায়, বলে—" বাতাসই যদি খাবে, তবে মাঠে যাও না কেন?" এইতো ঘরের দশা। তার পর খাদ্য দ্রব্যের কথা কিছু বলি। এদেশে ভয়ানক কাঁকর। ভাত, ডাল, তরকারি, সমস্ত জিনিষেই কে জানে কেমন করিয়া কাঁকর মিশিয়া থাকে; -কেবল দুধটা খুব ভাল ও খুব শস্তা। তরকারির মধ্যে কেবল ঝিঙ্গে ও লাউ, আর কিছু পাওয়া শক্ত। একটী বন্ধু আমার চাকরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের এখানে পটল পাওয়া যায় না?" সে উত্তর করিল "পরোল? সেই বেগুনের মত? মিলে!" বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "চিচিঙ্গে পাওয়া যায়?" চাকর খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল "বাবু! ও আংরেজী

বাত হাম নেহি সমঝতা হ্যায়" অর্থাৎ ও "ইংরেজী কথা আমি বুঝি না"!!
এখানকার যিনি জমীদার তাঁহাকে টিকাইত বলে। তাঁহার বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। এখানকার কুমারেরা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে না, টিকাইতের বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা আমাদের ওদিককার একজন কুমার আসিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের দেশের প্রতিমায় ও এখানকার প্রতিমায় কোন তফাৎ নাই। তবে পূজার রকমে একটু তফাৎ দেখিলাম। আমাদের যেমন তিন দিন পূজা হয়, এখানে সেরূপ না হইয়া নবমীর দিন পূজা হইল। সেই দিন মস্ত মেলা বসিয়াছিল, এবং দুই তিন দল সাঁওতাল মেয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিয়াছিল। আমি সাঁওতালদের নাচ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সাঁওতাল পুরুষেরা কেহ বাঁশি বাজাইতেছে, কেহ 'মাদোল' নামক মৃদঙ্গের মত একরূপ যন্ত্র বাজাইতেছে, আর দলে দলে মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতে করিতে মাদোলের তালে তালে নাচিতেছে। আমাদের দেশের কোমোর-দোলান বিশ্রী নাচের চেয়ে সাঁওতালদের নাচ অনেক ভাল। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে আর কিছু কথা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিতেছি।
মেলাতে সাঁওতাল নাচ দেখিয়া আমরা কিছু উত্তরে পদ্ম-ঝিল দেখিতে গেলাম। সেই ঝিলটীতে রাশি রাশি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে। যাইবার সময় পথে এক যায়গায় ভয়ানক ভিড় দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে কান্না পায়। দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মাঠের এক পাশে একটা সাদা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে, আর এক পাশ হইতে বাবুরা 'বাজি' রাখিয়া বন্দুক চালাইতেছেন, কে ছাগলটাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে। শুনিলাম যাহার গুলিতে ছাগল মরিবে, টিকাইত তাহাকে পুরস্কার দিবেন। হায়! হায়! মুর্খদের কি দুর্বুদ্ধি! আর নাইবা হবে কেন! যাদের "দারু" অর্থাৎ মদ না হইলে দিন চলে না, যাহাদিগকে মদ ছাড়িতে বলিলে, উল্‌টে, বলিয়া ফেলে "আপ কলম্ ছোড়িয়ে, তব হামলোগ্ দারু ছোড়েঙ্গে" অর্থাৎ "আপনি লেখাপড়া ছাড়ুন, তবে আমরা মদ ছাড়িব", যাহারা জুয়া খেলিয়া সমস্ত টাকাকড়ি নষ্ট করিতে বসিয়াছে তবুও সে পাপখেলা ছাড়িবে না, যাদের স্ত্রীপুরুষের দশহাজারের মধ্যে দশজন ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যায় না, তাদের আর কত হবে! যাহাহউক, আমরা আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পদ্মঝিলের সুন্দর শোভা দেখিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম যে, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সবই সুন্দর, কেবল মানুষই খারাপ।
সাঁওতালদের কথা বলিতেছিলাম, সাঁওতালেরা এর চাইতে অনেক ভাল। তাহারা অসভ্য বটে, বনে জঙ্গলে থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও ঠকাইতে জানে না, চুরি বা মিথ্যা কথার কোন ধার ধারে না, এবং অকারণে কাহাকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না। আজ কাল গাঁয়ের কাছে যারা থাকে, তাহারা দেখিয়া দেখিয়া দু পাঁচ জন ঠকামি শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে ইহারা আপন মনে নিজের দলে, সভ্য লোকদের সীমার বাহিরে আপনাদের 'মাঝি' অর্থাৎ দলের কর্ত্তার অধীনে বাস করে, সেখানে ইহারা বড়ই ভাল লোক। আমি এক দিন এই স্থানের নিকটে এক যায়গায় পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণা হওয়ায়, কাছে একজন সাঁওতাল ক্ষেত চষিতেছে দেখিয়া তাহার নিকট জল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে সাঁওতাল আমাদের লোকের নিকটে থাকিয়া কিছু সভ্য হইয়াছে, কাজেই ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। আমি বলিলাম "বাপু! আমার তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, একটু 'পাণি' দিতে পার।" সে লোকটা কেউ মেউ করিয়া কি বলিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল গুটী দুই কথা বুঝিলাম–"কুঁইয়া? কুঁইয়া? হুইরে খাব্‌রিয়া" অর্থাৎ "পাতকুয়া ওই খাব্‌রা অর্থাৎ খোলার বাড়ীর কাছে আছে।" সভ্য সাঁওতাল জল দিল না, কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের কথা বলি শুন। আমি পরেশনাথ পাহাড়ে যাইতেছিলাম, পথে তৃষ্ণা হওয়াতে একটা জঙ্গুলে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। ছোট রাস্তা, দুপাশে বড় বড় কালকাশুন্দের গাছ। তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক সাঁওতালকে পাইলাম। সে একটী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গরু চরাইতে যাইতেছিল। আমি জল চাহিবা মাত্র ছেলেটীকে গরুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বড় সাঁওতাল নিজে বাড়ীতে গেল এবং পরিষ্কার মাজা ঘটিতে করিয়া আমাকে অতি সুমিষ্ট ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল।
আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষ মানুষ দেখিলে লজ্জায় কোন্ কোণে পলাইবে, তাহার ঠিক থাকে না, সাঁওতাল মেয়েদের সেরূপ ভাব নহে। তাহারা নিঃসঙ্কোচে রাস্তা দিয়া ছেলেদের মাই খাওয়াইতে খাওয়াইতে চলিয়া যাইতেছে, কাহারও ভয় নাই। খুব গভীর জঙ্গলে যে সব সাঁওতাল থাকে, তাহাদের পুরুষ মেয়ে কেউ কাপড় পরে না, কেবল কোমরে পাতা সেলাই করিয়া জড়ায়। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত যত সাঁওতাল দেখিয়াছি, তার মধ্যে পুরুষদের কাপড়ের কৌপিন এবং মেয়েদের প্রায় আমাদের মত বড় কাপড় এবং রূপার গয়না, মল, নথ, ইত্যাদি দেখিয়াছি।
আমার একটী বন্ধুর নিকট শুনিলাম অসভ্য সাঁওতাল যায়গা জমি লইয়া আমাদের মত মকদ্দমা মাম্‌লা করেনা, জমীদার বেশী টাকা খাজানা চাহিলে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এবং বনের মধ্যে আপনাদের 'মাঝি'র অধীনে অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে। সাঁওতাল যে ঠকাইতে জানেনা, ইহা আমার কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন জিনিষের জন্য আগের দিন পয়সা দিলে, পরের দিন যে সেই দামের জিনিষ ঘরে বসিয়া পাইবে, এবিষয়ে তোমরা সভ্য জনকে, চতুর লোককে বিশ্বাস করিতে পার আর নাই পার, অসভ্য সাঁওতালকে বিশ্বাস করিতে পার। সাঁওতাল যে মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, তাহার একটা গল্প শুন। একবার এক সাঁওতাল অন্য একজন লোককে মারিয়া ফেলে। ইংরাজের রাজ্যে কি খুন করিয়া বাঁচিবার যো আছে? সাঁওতালকে ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। একজন মোক্তার (সভ্য লোক কি না!) প্রাণপণে সাঁওতালকে শিখাইলেন, "বলিস আমি খুন করি নাই।" সাঁওতাল বলিল "আচ্ছা।" সকলি ঠিক। ম্যাজিষ্ট্রেট সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করাইলেন "তুমি অমুককে মারিয়াছ কেন?" সাঁওতাল বলিল "আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছিল, মারিব নাতো কি?"
এবারকার এই পত্র বড় মস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আজ এইখানেই শেষ করি। আগামীবারে, কয়লার খণি, শ্লেটপাথরের নদী বা জল প্রপাত, এবং পরেশনাথ পাহাড়ের কথা বলিব। দেখিবার বিষয়, জানিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য দয়ার আশ্চর্য্য কাণ্ড বুঝিতে না পারে তাদের বেড়ানই মিথ্যা, তাদের চোখ কাণ কেবল বোঝার মতন, তাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না।

পচম্বা, গিরিধি।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী

সম্পাদক

দ্বিতীয় পত্র

সখা সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্র আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিলাম।
আমার প্রিয় বালক বালিকাগণ।-- যাহা দেখি সবই যদি খুলিয়া বলিতে পারি তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না, কিন্তু আমার সে সাধ্য নাই। বড় হইয়া নিজে যদি কখনও দেশ বিদেশে বেড়াইতে পার এবং ভাল চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কত সুন্দর, কত মধুর, কত চমৎকার। আমি যেখানে আছি এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে কয়লার খণি আছে, খণি কাহাকে বলে জান? এক একটা যায়গার অনেক দূর পর্যন্ত মাটীর নীচে কয়লা পাওয়া যায়, এই কয়লাতে সমস্ত বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ কল চলে। লোকে মাটীর নীচে গর্ত করিয়া, মাটীর নীচ দিয়াই বরাবর পথ করিয়া কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত করে, ইহারই নাম খণি বা খাদ, মাটীর অনেক নীচ পর্যন্ত কয়লা থাকে এই জন্য দুতলা, তিনতলা, চারতলা, এই রকম তলা আছে। কোন কোন খণিতে অনেক তলা আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা যেটাতে গিয়াছিলাম, সেটা ছোট তাহাতে দুতলা বই নাই।
আমি ঘোড়ায় চড়িয়া খণি দেখিতে গিয়াছিলাম। খনিতে নামিবার রাস্তা ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে গিয়াছে সুতরাং বেশ হাটিয়া যাওয়া যায়, নামিবার দরজাটায় একটু আলো আছে বটে; কিন্তু মধ্যে আলো জ্বালিয়া যাইতে হয়।
আমাদের সঙ্গে কয়লার খণির একজন লোক আলোক ধরিয়া যাইতেছিল, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে যাইতে লাগিলাম, দুপাশে কয়লার দেওয়াল। উপরে কয়লার ছাদ আঁটা, নীচে কয়লার রাস্তাঃ- আমরা এইরূপ স্থানে এইরূপ পথে সাবধানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু একটা বিপদে পড়িলাম, খণির মধ্যে তো বাতাস যাইবার পথ নাই, সুতরাং তোমরা বুঝিতেই পার সেখানকার বাতাস লোকের নিশ্বাসে নিশ্বাসে কত ভারী হইতে পারে, আমার কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। আর দুতলায় নামিতে ইচ্ছা করিলাম না। সঙ্গের আলোধারী লোককে বলিলাম "বাপু আমাদিগকে বাহিরে লইয়া চল। আর নীচে যাইব না।" কিন্তু বাহির হইবার রাস্তা ত সহজ নয়, দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে অনেক পথ গেলে তবে বাহির হইবার রাস্তা পাওয়া গেল। কিন্তু ইতি মধ্যে কি কি দেখিলাম তাহা বলি। খনির অনেক যায়গাতেই সোজা হইয়া চলিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও কোথাও কুঁজো হইয়া পথ চলিতে হয়। আমরা কখনও কুঁজো হইয়া কখনও সোজা হইয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম, মজুরেরা কয়লা কাটিয়া বাহির করিতেছে। তাহাদের কাছে একটা আলো ও হাতে এক-এক

খানা মাটী খোঁড়া কুড়াল, মজুরদের মধ্যে দু একজন স্ত্রীলোক এবং অনেক বালক দেখিলাম। সেখানে সাদা কালো নাই। সবই কালো দেখিলাম। অনেক সুশ্রী ছেলে কয়লাতে এমনি কালো হইয়া গিয়াছে যে ঠিক যেন চূণাগলির কালো পোষাক পরা ফিরিঙ্গী। যেখানে কয়লা কাটা হইতেছে তাহার নিকটে সরু রাস্তা, তাহাতে কয়লা টানিবার জন্য রেল ফেলা। কয়লা কাটা হইলে বড় বড় লোহার বা টিনের বালতিতে বোঝাই করিয়া, রেলের উপরে খোলা ঠেলা গাড়ীতে সরাইয়া দেয়; সেখান হইতে অল্প ঠেলিয়া দিলেই কয়লার গাড়ী, যেখানে উঠিবার রাস্তা, সেই পর্যন্ত চলিয়া আসে, কখনও বা লোকে ঠেলিয়া সে পর্যন্ত লইয়া যায়। উঠিবার রাস্তা সিঁড়ির মতন মনে করিতেছ বুঝি? না, না, তা নয়। আমরা এখন যেখানে পৌছিলাম সেখানে গিয়া দেখিলাম উপরের সূর্যের আলো দেখা যাইতেছে। এবং উপর হইতে লম্বা একটা লোহার শিকল নামিতেছে, এই শিকলের শেষ ভাগটায় তিনটা মুখ; এই তিনটা মুখ বালতির চারিদিকের তিনটা কড়ার সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইল, আর সঙ্কেত করিবা মাত্র বালতি কয়লা শুদ্ধ উঠিয়া চলিয়া গেল। আবার বালতি ফিরিয়া আসিল। এই বারে আমরা তাহাতে দাঁড়াইয়া শক্ত করিয়া শিকল ধরিলাম। পাশের লোকেরা উপর দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আস্তে মানুষ বালতি", আর অমনি আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেলাম। কোথায় নামিয়া ছিলাম আর কোথায় আসিয়া উঠিলাম, চাহিয়া দেখি একটা বাষ্পীয় যন্ত্র কপিকলে করিয়া আমাদিগকে টানিয়া তুলিয়াছে এবং আমরা যেখান দিয়া নামিয়াছিলাম তাহা হইতে বহুদূরে আসিয়া উঠিয়াছি।

কয়লার খণিতে বিস্তর টাকা লাভ হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সেদিকে মতি নাই। যত কয়লার খণি, হয় গবর্ণমেণ্টের না হয় রেলওয়ে কোম্পানীর না হয় অন্য কোন ইংরেজ কোম্পানীর। আমরা যে খণি দেখিতে গিয়াছিলাম সে জায়গাটা এখানকার টিকাইতের ছিল। কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কিছু করিতে না পারিয়া নয় লক্ষ টাকা মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, আর এখন কত নয় লক্ষ টাকা তাহা হইতে লাভ হইবে কে জানে?

বিনা পরিশ্রমে বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে কি কখনও কোন কাজ হয়? খণি হইতে কয়লা উঠাইতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কখনও কখনও মজুরদের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। অন্ধকারে সামান্য আলোতে কাজ করা সহজেই বুঝিতে পার কত বিপদের সম্ভাবনা। আবার ইহা ছাড়া খণিতে আর একটা মহা বিপদের ভয় আছে। খণির মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে না, পূর্বেই বলিয়াছি বাতাস ঢুকিতে না পারায় মধ্যের বাতাস খারাপ হইয়া গিয়া লোকের নানারূপ ব্যারাম হইয়া থাকে এবং মধ্যের খারাপ হাওয়া কখন কখনও প্রদীপের আলো লাগিয়া জ্বলিয়া ওঠে; তখন মজুরদের প্রাণে বাঁচা শক্ত। যদিও এই শেষের লিখিত বিপদ বারণ করিবার জন্য আজকাল "অভয় প্রদীপ" নামে একরকম নূতন আলোর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই খণিতে তাহার একটীরও বন্দোবস্ত দেখিলাম না।

এখন শ্লেট পাথরের নদীর কথা কিছু বলিব। এই নদী আমার থাকিবার যায়গা হইতে আধ মাইলের অধিক হইবে না; সুতরাং আমি হাঁটিয়াই গেলাম। নদী বলিলে যদি তোমাদের গঙ্গা বা অন্য কোন নদীর কথা মনে হয়, তাহা হইলে আমি নদী না বলিয়া অন্য কিছু বলি, কেননা আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার উপর দিয়া পথ গিয়াছে, এবং গরু, মহিষ, গাড়ী, ঘোড়া, তাহার উপর দিয়াই যাইতেছে উপরে এক হাত কি দেড় হাত বালি। তাহার নীচে চমৎকার শ্লেট পাথর, আমরা দেখিলাম নদীর যে ভারে উপর দিয়া পথ হইয়াছে সেখানে ঝির ঝির করিয়া একটু একটু জল আসিতেছে, আরও নীচে আসিয়া তাহার সহিত এইরূপ দশ জায়গা হইতে দশটী ছোট ছোট জলের স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে এবং সকল গুলি এক হইয়া একটু তেজের সহিত পাথর ডিঙ্গাইয়া কুল কুল শব্দে নীচে চলিয়া যাইতেছে। আমরা এইখানে একটা পাথরের উপরে বসিলাম, এবং সেই স্থানের সুন্দর শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে মনে মহাসুখী হইতে লাগিলাম। এখানে জলের তেজে বালি দাঁড়াইতে পারে না, কেবল কালো পাথরের উপর দিয়া সাদা জল সূর্যের কিরণে চিক্ চিক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। শ্লেট পাথরগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজান, তাহা আর কি বলিব? কোন যায়গাটা ত্রিকোণ, কোন যায়গাটা অর্ধচন্দ্রের মত, কোন যায়গাটা চারিকোণ, এইরূপ নানারূপ সুন্দর ভাবে সাজান রহিয়াছে। শ্লেট পাথরে সুন্দর লেখা যায়, আমি এক খণ্ড পাথর লইয়া বড় একটা পাতের উপর লিখিলাম "ইশ্বরের কি দয়া!" আর তাহার উপর দিয়া শীতল জল ঝির ঝির করিয়া যেন সেই লেখা দেখিতে দেখিতে নামিয়া চলিল।

একবার ইচ্ছা হইল, এই সকল জল কোথা হইতে আসিতেছে তাহা খুঁজিয়া দেখি। এই ভাবিয়া পাথরের নুড়ি কুড়াইতে কুড়াইতে নদীর যেদিক হইতে জল আসিতেছে সেই দিকে চলিলাম। অনেক দূর গেলাম, কিন্তু সেখানে হায়েনার গায়ের যেমন গন্ধ সেইরূপ গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। আমরা সেই "বোটকা" গন্ধে ভয় পাইয়া, আর যাইতে সাহস করিলাম না। আর একটু গেলেই হয়ত এখন যে সকল কথা লিখিতেছি তাহা আর লিখিবার লোক থাকিত না। আমরা বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আরো অনেক কথা বলিবার রহিল; বারান্তরে তোমাদিগকে জানাইব।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী

সম্পাদক

তৃতীয় পত্র

পরেশনাথ মন্দির

পরেশনাথ পাহাড় জৈন নামক লোকদিগের একটা বড় তীর্থ স্থান। এইখানে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত্য অনেক জৈন যাত্রীর ভিড় হয়। জৈনেরা পরেশনাথকে পরম দেবতা মনে করে, এবং জীবহত্যা অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মারা বা ক্লেশ দেওয়াকে অত্যন্ত অন্যায় ভাবিয়া থাকে! পরেশনাথ পাহাড় গিরিধি হইতে নয় ক্রোশ দক্ষিণে। ইহার মধ্যে এক স্থানে 'বরাকর' নামক একটী নদী আছে। রাস্তার দুদিকে ছোট ছোট পাহাড় দেখিতে দেখিতে আমরা বিনা ক্লেশে বরাকর পর্য্যন্ত আসিলাম। সেখানে আহারাদি করা গেল। এইখানে "রাজবালা ধর্ম্মশালা" নামে জৈনদের একটী মন্দির আছে। আমরা এই ধর্ম্মশালা দেখিয়া নদী পার হইলাম, এ সময়ে বরাকর নদীতে এক হাটু বা কিছু অধিক মাত্র জল থাকে; সুতরাং আমরা সহজেই নদী পার হইয়া গেলাম।

রাস্তায় ভয়ানক রদ্দুরে ছাতা মাথায় দিয়াও কিছু ক্লেশ পাইতে হইল; যাহা হউক বিকালবেলা পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

পাহাড়ের নীচের স্থানের নাম মধুবন। শুনিয়াছি ধ্রুব মধুবনে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সেই মধুবন কিনা, তাহা জানিতে পারিলাম না। আমাদিগের কোন বন্ধু আমাদের জন্য মধুবনের এক জৈন মন্দিরের বা কুঠির অধ্যক্ষকে আগেই এক পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগকে গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। মধুবনে অনেকগুলি জৈন মন্দির। কুঠির অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে সকল গুলিই যত্নের সহিত দেখাইলেন। আমরা তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম মান্য করিয়া দরজায় যুতা, ছাতা, লাঠি প্রভৃতি রাখিয়া গেলাম। এই মন্দিরগুলি নির্ম্মান করিতে যে কত শত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার সীমা কি? অনেক মন্দিরই আগাগোড়া পাথরের তৈয়ারী। সকলগুলির মধ্যেই মেজে মার্ব্বেল পাথরে মোড়া এবং মূর্ত্তিগুলি নানারূপ সুন্দর অলঙ্কারে সাজান ও চমৎকার আসনে জরির কাজ করা শামিয়ানার নীচে বসান। পরেশনাথ প্রধান দেবতা; ইহা ছাড়া আরও তেইশ জন অবতার আছেন, এই কথা কুঠির অধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম। প্রত্যেক মন্দিরের দরজায় একজন বা দুজন করিয়া দ্বারবানদেবতা আছেন। তাঁহাদের আকার নাই, পাথরের এক একটা লম্বা খণ্ড, তাতেই সিন্দূর-মাখান।

পরেশনাথ পাহাড় প্রায় তিন হাজার হাত উচ্চ। রোগা লোকের সাধ্য কি, হাটিয়া উঠে। আমরা ডুলিতে গিয়াছিলাম। সকল যায়গায় রাস্তা নাই। উপরে সাহেবদের জন্য একটা ঘর আছে, সেই পর্যন্ত ভাল রাস্তা, তাহার ওদিকে আর রাস্তা নাই; কেবল পাথরের উপর দিয়া একটু একটু পরিস্কার করা। পাহাড় বলিলে কি তোমাদের কেবল পাথরের ঢিবি মনে হয়? তাহা নহে,পাহাড়ের উপরে যে কত রকম গাছ জন্মিয়াছে,তাহার সীমা কি? আমি এই সকল গাছের মধ্যে বাঁশগাছ, কলাগাছ এবং হলুদগাছ,ইহাই চিনিতে পারিলাম।ইহা ছাড়া ছোট ছোট অগছা হইতে শাল সুন্দরীর মত বড় বড় গাছ যে কত আছে,তাহা গণিয়া উঠা যায় না।

একবার একটী ইংরাজ স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন "এদেশের পাখীগুলি কেবল দেখিতেই সুন্দর,কিন্তু গান করিতে পারে না,খালি ক্যাচ্‌ম্যাচ্ করে।" যদি তিনি এই পাহাড়ে আসিতেন,তাহা হইলে তাঁহার এই বিশ্বাস চলিয়া যাইত!আমার পথ চলিতে চলিতে বোধ হইল যেন স্বর্গে যাইতেছি। একদিকে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরণার জল পড়িতেছে,একদিকে শোঁ শোঁ করিয়া গাছের মধ্যে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে শীতল বাতাস বহিয়া চলিয়াছে,একদিকে পাখীগুলি টুউ, টুইট্,টুউ টুইট্ শব্দে কি সুমধুর গানই ধরিয়াছে,এদিকে রাস্তার দুপাশে দুর্গাঝাঁপ বা ফার্ণ জাতীয় গাছ সকল যেন সুন্দর সবুজ মক্মলের মত আপনাদের সুশ্রীরূপ পথের লোককে দেখাইতেছে – এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইল একবার সেইখানে লাফাইয়া পড়ি এবং এই সুন্দর সৃষ্টি যাঁর সেই পরম পিতা

পরমেশ্বরের নামে চিরদিনের মত ডুবিয়া যাই।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য!যে শোভা দেখিয়া আমার মন গলিয়া গেল,সেই শোভা দেখিয়াও কোন লোকের মনে খারাপ ভাব থাকে!পথের মাঝখানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটা ছোট ঘর আছে। তাহার কাছে গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ শব্দে জল পড়িতেছে,পাখীগুলি যেন তাহারই শব্দে তাল রাখিয়া গান করিতেছে,আর চারিদিকে গাছের শীতল ছায়া যেন পরিশ্রান্ত যাত্রীকে কোলে টানিয়া লইতেছে। এই শোভা,এই বাহারের মধ্যে যাহার ভগবানকে মনে পড়ে না,সে কি দুর্ভাগা!আমি দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেলাম,আমাদেরই কতকগুলি ছেলে (হাতের লেখায় বুঝিলাম বয়স বেশী নয়)এই বিশ্রামঘরের দেয়ালে বিশ্রী ছবি এবং বাঙ্গালাতে বিশ্রী কথা সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হতভাগা ছেলেদের ইহাতেও সাধ মেটে নাই,আবার তাহার সঙ্গে নিজেদের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন!দিগ্গজ পন্ডিতদের কাহারও বাড়ি ছুতোর পাড়া কাহারও বাড়ী কালেজ স্ট্রীট,কাহারও উহারই নিকটে। আমি বাঙ্গালী – বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশে আসিয়া এমন কাণ্ড করিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার লজ্জা ও ঘৃণা দুই হইতে লাগিল। তখন নিজের লজ্জা নিজেই ঢাকিবার জন্য সেই সকল খারাপ ছবি ও লেখা মুছিয়া ফেলিতে লাগিলাম। সকলই মুছিয়া ফেলিলাম কেবল খুব উপরে একটা লেখা হাতে পাইলাম না। দুরাত্মাদের খারাপ স্বভাবের একটা চিহ্ন সেই পবিত্র স্থানে থাকিয়া গেল।
একটা পাহাড় ডিঙ্গাইয়া বড় পাহাড়টাতে উঠিতে হয়। বড় পাহাড়ের রাস্তা যে কি ভয়ানক,তাহা বলিতে পারিনা। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের এক ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে, সেখান হইতে মাটী পর্য্যন্ত এক-ঢালু,তাকাইলে মাথা ঘোরে;কোন স্থানে দুপাশে বড় বড় ঘাস ও ভাঁটুইবন,তাহার মধ্য দিয়া সাপের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হয়;আবার কোথাও বা উপরে উঠিতে ডুলির তলায় ক্রমাগত পাথর ঠেকিতে থাকে, ঘা খাইয়া শরীরে বেদনা হইয়া প্রাণ যায়। এই ভাবে,কতক আহ্লাদে কতক ভয়ে আমরা উপরে উঠিলাম। আঃ – সেখানকার কি শোভা! এক এক ঝল্কা বাতাস গায়ে লাগে আর বোধ হয় যেন শরীর পাতলা হইয়া গেল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ নীল – গাঢ় নীল। নীচে ওরূপ নীলাকাশ প্রায়ই দেখা যায় না। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম কুয়াসার ন্যায় বাতাসে মেঘগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে,আমরা মেঘের সীমা ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া ফেলিয়াছি! বাতাসে বেশ একটু শীত লাগে,কিন্তু তাহাতে বড়ই আরাম হইতে লাগিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম ছোট পাহাড়টাকে একটা বনের মত,বড় বড় গাছগুলিকে ঘাসের মত এবং অন্যান্য স্থানগুলিকে রং করা ছবির মত দেখাইতেছে।
উপরে অনেকগুলি মন্দির আছে,কিন্তু সেগুলি মধুবনের মন্দিরের ন্যায় বড় বা সুন্দর নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে মন্দিরটা,আমরা তাহারই নিকটে স্নানাহার করিলাম। সঙ্গে তেল ছিল না,কি করি,খানিকটা ঘি মাখিয়া ঝরণার জলে স্নান করিলাম। সে যে কি আরাম,তাহা আর কি বলিব। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিদের কথা মনে হইতে লাগিল। সাধে কি তাঁহারা পাহাড় পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করিতেন! একজন ইংরাজ বলিয়াছেন "প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্য হইতে প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁহাকে সহজেই পাওয়া যায়।" আমার একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আঃ – এই রকম যায়গায় দুচারজন মনের মত লোক লইয়া থাকিতে পারিলে বড়ই সুখ হয়।" আমি বলি – "যেখানে গেলে চারিদিকের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরকে যেন সাক্ষাৎ দেখা যায়,সেখানে আর কোন মনের মত লোকের আবশ্যক কি? সহরের সভ্যতার 'সরগরমে' ঝল্সিয়া মরার অপেক্ষা এমন সুন্দর স্থানে,ভগবানের সৃষ্টির বাহারে আপনাকে ঘেরিয়া,তাঁহার নাম করিয়া অসভ্যের মত একলা দিনশেষ করাও ভাল।"
ইহার পর আরও কোন কোন স্থান দেখিয়া আমরা নামিয়া আসিলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস
প্রথম পত্রদুটি 'সখা' পত্রিকার ১৮৮৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় এবং তৃতীয় পত্রটি ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

[মূল লেখার বানান ও বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। - সম্পাদক]

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 1
গড় : 5.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

-->

বেড়ানোর মতই বইপড়ার আদতও বাঙালির চেনা সখ - তা ছাপা হোক বা ই-বুক। পুরোনো এই ভ্রমণ কাহিনিগুলির নস্টালজিয়া তাতে এনে দেয় একটা অন্যরকম আমেজ। আজকের ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি লেখক-পাঠকেরা অনেকেই শতাব্দী প্রাচীন সেইসব লেখাগুলি পড়ার সুযোগ পাননি। 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের জন্য এবার পুরোনো পত্রিকার পাতা থেকে অথবা পুরোনো বইয়ের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে পত্রিকার পাতায়।

[সামাজিক ন্যায় ও নারীর সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার 'A Vindication of the Rights of Woman'-এর ইংরেজ লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft)। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে (১৭৫৯-১৭৯২) নানা ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন মেরি। ১৭৯২-তে ফরাসী বিপ্লবের রূপ সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করতে ফ্রান্সে গিয়ে আমেরিকান ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রী গিলবার্ট ইমলের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। জন্ম হয় কন্যা ফ্যানির। অস্থির ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরার কিছুকাল পরেই মেরিকে যেতে হয় স্ক্যান্ডিনেভিয়া ইমলের ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে। 'Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark' ১৭৯৫ সালে তাঁর এই যাত্রারই অত্যন্ত ব্যক্তিগত এক বিবরণী - আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগে এক নারীর একলা বেরোনোর কথা। একাকী এই ভ্রমণ নিজের চারপাশের জগতের সঙ্গে এবং তাঁর ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে তুলতে ওলস্টোনক্রাফটকে সাহায্য করেছিল। ফ্যানিকে তিনি রেখে এসেছিলেন গিলবার্টের কাছে। ভ্রমণকালীন এই চিঠিগুলিও তিনি গিলবার্টকেই লিখতেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণের পরপরেই গিলবার্ট মেরিকে ছেড়ে চলে যান। পরে মেরি বিবাহ করেন খ্যাতনামা লেখক উইলিয়াম গডউইনকে। এই বিবাহ সুখের হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁদের সন্তান মেরির জন্মের দশ দিনের মাথায় মৃত্যু হয় মেরি ওলস্টোনক্রাফটের। কন্যা মেরি বড় হয়ে কবি পার্সি বেইশি শেলিকে বিবাহ করেন। ওই একই বছর আত্মহত্যা করেন ফ্যানি। মেরি শেলির বিখ্যাত উপন্যাস 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'।]

নরওয়ের দিনগুলি

(সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্কে স্বল্পকালীন বাসের সময় লেখা চিঠি থেকে)

মেরি ওলস্টোনক্রাফট

সমুদ্র ছিল উত্তাল, কিন্তু আমার সারেংটিও ছিল অভিজ্ঞ, মনে তাই বিপদের কোনও আশঙ্কাই ছিল না। শুনেছিলাম কখনোসখনো ঢেউ-এর টানে নৌকা বেশি গভীরে চলে গেলে হারিয়ে যায়। তবে কিনা বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে চুলচেরা হিসেবনিকেশ আমি খুব কম সময়ই করে থাকি - চোখের সামনে যে সব ঝামেলা জ্বলজ্বল করছে রোজের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট!

আমাদের নৌকাটাকে নিয়ে যেতে হচ্ছিল দ্বীপপুঞ্জ আর বিরাট বিরাট পাথরের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে, তটভূমিকে যথাসম্ভব চোখের আড়াল না হতে দিয়ে, যদিও মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল শুধুই কুয়াশার সীমারেখা টানা আছে জলের প্রান্তে। সারেং আশ্বাস দিয়েছিল, নরওয়ে উপকূলের অজস্র পোতাশ্রয়ই খুব নিরাপদ, সবসময় পাহারাদার নৌকার নজরদারি থাকে। এও জানলাম যে সুইডেনের দিকটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক; ভিনদেশি নৌকাকে সৈকতের আশেপাশে ওঁত পেতে থাকা ডুবো পাহাড়গুলোকে এড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত অভিজ্ঞ সাহায্য বেশিরভাগ সময়েই পাওয়া যায় না।

এখানে জোয়ার-ভাঁটা নেই, ক্যাটেগাট-এও তাই, আর আমার কাছে যেটা প্রাসঙ্গিক মনে হল, কোনও বেলাভূমিও নেই। হয়ত এটা আগেই খেয়াল করেছিলাম, কিন্তু ভেবে দেখিনি, এখন লক্ষ্য করলাম ঢেউগুলো এক নাগাড়ে রিক্ত পাথরের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, পিছিয়ে যাওয়ার মত অবকাশই থাকছেনা যাতে তলানিটুকু থিতিয়ে শক্ত হতে পারে।

বাতাস অনুকূলই ছিল, কিন্তু আমাদের গতিপথ ঘোরাতে হল লারভিক-এ প্রবেশের জন্য, বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছালাম সেখানে। পরিষ্কার, সুন্দর শহর, প্রচুর লোহার কাঠামো, সেগুলো প্রাণসঞ্চার করেছে এখানে।

নরওয়ের বাসিন্দারা ঘন ঘন পর্যটকদের দেখা পায়না তাই তারা খুব কৌতূহলী হয়ে থাকে কে এসেছে আর কেন এসেছে তা জানতে - এতটাই কৌতূহলী যে আমি প্রায় প্ররোচিতই হয়ে গিয়েছিলাম ডাঃ ফ্রাঙ্কলিনের মতো - তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের সময়, সেখানকার লোকও এইরকমই বাড়াবাড়ি কৌতূহলী ছিল - একটা কাগজে লোকজন যাতে পরিদর্শন করতে পারে এমনভাবে নিজের নাম, ঠিকানা, কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব, কী উদ্দেশ্যে ইত্যাদি লিখে রাখতে। তবে এই তীব্র কৌতূহলে যদি আমি উত্যক্ত হয়েও থাকি, লোকজনের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমাকে খুশি করেছে। একজন মহিলা, একা একা এসেছে, ব্যাপারটাতে তাদের আগ্রহ হয়েছিল। আর ঠিক জানিওনা যে, ক্লান্তি-অবসন্নতার জন্য আমাকে অদ্ভুতগোছের পলকা-দুর্বল দেখাচ্ছিল কিনা; কিন্তু লোকেরা আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছিল, জিজ্ঞাসা করছিল আমার কিছু চাই কিনা, যেন ওদের ভয় হচ্ছিল যে আমার চোট লাগতে পারে, আর চাইছিল আমাকে রক্ষা করতে। আমার জন্য জাগরুক এই সহানুভূতি, অচেনা একটা দেশে আকাশ থেকে ঝরে পড়ার মত, ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। যদি আমার মনটা তিক্ত না হয়ে থাকত নানা কারণে - অতিরিক্ত চিন্তায় - ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগলামির মত - বুকের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা একটা হালকা বিষণ্ণতার জন্য, প্রথমবার মেয়েকে ছেড়ে আসায় - তাহলে যতটা অনুভব করতাম, তার থেকে অনেক বেশি আপ্লুত হয়েছিলাম।

তুমি তো জানো আমি নিজেও নারী বলে ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটা বেশি - মায়ের স্বাভাবিক স্নেহ ও দুশ্চিন্তার থেকে আমার অনুভবটা আরও গভীর, বিশেষ করে যখন মনে হয় মেয়েদের পরমুখাপেক্ষিতা এবং দমিত অবস্থার কথা। আতঙ্ক হয় এই ভেবে যে ও হয়তো বাধ্য হবে নীতির কাছে নিজের হৃদয়াবেগকে বলি দিতে, বা হৃদয়ের কাছে নীতিকে। কাঁপা হাতে আমি চর্চা করব সংবেদনশীলতার, যতনে সাজাবো কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে, পাছে গোলাপকে সতেজতার আভা দিতে গিয়ে আমি কাঁটাগুলোতে না শান দিয়ে ফেলি আর সেগুলো ক্ষতবিক্ষত করে আমারই সাগ্রহে আগলে রাখা হৃদয়টাকে - ওর মনকে উন্মোচিত করতে ভয় লাগে আমার, পাছে তাতে ও অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে এই জগতের, যেখানে ওকে বাস করতে হবে - হে অসহায়া নারী!

হায় কী অদৃষ্ট তোমার!

কিন্তু কোথায় যেন ছিলাম? আসলে তোমাকে এটাই বলতে চাইছিলাম সাদামাটা মানুষগুলোর দয়ালু ব্যবহার আমার মধ্যে এমনই প্রভাব ফেলেছিল যে তা আমার সংবেদনশীলতাকে আরও কষ্টকর করে তুলেছিল। আমি চাইছিলাম একটা ঘর পেতে, আমার একার জন্য, কারণ ওদের যত্নআত্তি, আর পীড়াদায়ক পর্যবেক্ষণ আমাকে প্রচণ্ডভাবে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তবু, যখন ওরা ডিম নিয়ে আসছিল আমার জন্য, কফি বানিয়ে দিচ্ছিল, বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের এই আতিথেয়তার আন্তরিকতাকে আহত না করে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে এটাই রীতি যে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী অতিথিদের এমনভাবে অভ্যর্থনা জানাবেন যেন তারাই বাড়ির মালিক বা মালকিন।

আরেকদিকে আমার পোশাকআষাক মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল; আমার শুধু মনে পড়ছিল ছেঁদো অহঙ্কারের কথা যার জন্য অনেক মহিলাই অপরিচিতদের এই পর্যবেক্ষণে এতটাই গর্বিত হয়ে ওঠেন যে তাদের আশ্চর্য হওয়াটাকে খুব অযৌক্তিকভাবেই মুগ্ধতা ভেবে বসেন। এই ভুলটা করতে এঁরা মুখিয়ে থাকেন; যখন বিদেশে গেলে লোকজন এঁদের পথচলার দিকে তাকিয়ে থাকে; যদিও অধিকাংশ সময়েই আকর্ষণের কারণ হয়তো টুপির কায়দা কিম্বা গাউনের বৈশিষ্ট্য, তা পরবর্তীকালে এঁদের আত্মশ্লাঘার অসাধারণ কল্পসৌধকে পুষ্ট করে।

সঙ্গে কোনও ঘোড়ার গাড়ি আনিনি, আশা করেছিলাম যেখানে পৌঁছাব সেখানে এমন কারোর সঙ্গে দেখা হবে যে চটপট একটা জোগাড় করে দিতে পারবে। ফলতঃ আমাকে আটকা পড়তে হল, আর সরাইখানার ভদ্রজনেরা তাদের চেনাজানা সক্কলের কাছে খোঁজ পাঠালেন একটা গাড়ির জন্য। শেষ অবধি একটা লড়ঝড়ে ক্যাব্রিওলে পাওয়া গেল, সঙ্গে আধা মাতাল একটা চালক, তাল বুঝে একটা ভালো দাঁও মারার জন্য সে উদগ্রীব। আমার সঙ্গে ছিলেন জাহাজের এক ড্যানিশ ক্যাপ্টেন ও তাঁর মেট। প্রথমজনকে চাপতে হবে ঘোড়ার পিঠে, আর তিনি ব্যাপারটাতে বিশেষ পটু নন, দ্বিতীয়জন বসবেন আমার সঙ্গে। চালক পিছনে বসল ঘোড়াদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর আমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে সবেগে চাবুক ঘোরাতে লাগল। নিজের হাত থেকে রাশ আলগা করার কষ্ট সে করবে না। নিশ্চয় আমাদের সৃষ্টিছাড়া কিছু একটা দেখতে লাগছিল, তাই যখন চোখে পড়ল দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে থাকা একটা দলের মধ্যে ভদ্রলোকের মতো চেহারার একজনকে আমি নিজের মধ্যে গুটিয়ে না গিয়ে পারলাম না। সপাং সপাং করে মহিলা ও শিশুদের একসঙ্গে ডাকতে থাকার জন্য আমি হয়তো চালকের থেকে চাবুকটা নিয়ে ভেঙেই ফেলতাম, কিন্তু যাঁর কথা এক্ষুনি বললাম তাঁর মুখে তাৎপর্যপূর্ণ একটি হাসি দেখে, আমি তুমুল হাসিতে ফেটে পড়লাম, আর উনিও যোগ দিলেন তাতে, - এবং আমরা বেগে উড়ে চললাম। কথাটা কিন্তু লেখার অলঙ্কার নয়; আমরা সত্যিই অনেকক্ষণ ধরে পূর্ণগতিতে ছুটে গেছিলাম, ঘোড়াগুলো খুবই ভালো জাতের ছিল; এর চেয়ে ভালো ঘোড়া আমি আগে কখনও দেখিনি - নরওয়ের এই ডাকের ঘোড়াদের মত; ইংল্যান্ডের ঘোড়ার থেকে শক্তপোক্ত গড়নের, দেখলেই মনে হবে ভালো খাবারদাবার পায়, আর সহজে ক্লান্তও হয়না।

জেনেছিলাম যে আমাকে নরওয়ের সবচেয়ে উর্বর আর শ্রেষ্ঠ কৃষিঅঞ্চলটা পেরোতে হবে। দূরত্বটা তিন মাইল নরওয়ের মাপে, সুইডেনের মাপের হিসেবের চেয়ে বড়। রাস্তাগুলো ভারি চমৎকার; কৃষকরাই বাধ্যতামূলকভাবে রাস্তা সারিয়েসুরিয়ে রাখে; আমরা যে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গেলাম তার হাল ইংল্যান্ড ছাড়ার পর থেকে এখনো অবধি যা দেখেছি তার থেকে ঢের ভালো। যদিও এখানে যথেষ্ট পরিমাণেই পাহাড়, উপত্যকা আর টিলা আছে, যাতে এলাকাটা সমতল এমন কোনও ধারণা মাথায় না ঢোকে, কিংবা ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় সেসবের। সে সম্ভাবনা দূর করে জলভূমিগুলোও, নদী আর হ্রদ, তার পরেই গর্বিতভাবে আমার হৃদয় জয় করে নেয় সমুদ্র; রাস্তা প্রায়ই ছুটে চলেছে উঁচু উঁচু বনের ভেতর দিয়ে, যেগুলো প্রাকৃতিক শোভাকে ফুটিয়ে তুলেছে, অবশ্য ততোটা রোমান্টিক নয় যেমনটা আমি কিছুদিন আগেই উপভোগ করেছিলাম।

টন্সবার্গে পৌঁছাতে বেশ দেরি হল; একটি পরিচ্ছন্ন সরাইখানার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেলাম। পরদিন সকালে, ১৭ জুলাই, যাঁদের সঙ্গে কাজের প্রয়োজনে এসেছি সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম টন্সবার্গেই আমাকে তিন সপ্তাহ কাটাতে হবে। বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি বলে দুঃখ হল খুব। সরাইখানাটা শান্ত, আমার ঘরটাও এত আরামদায়ক, সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, রঙ্গালয়ের মতো আশপাশ ঘিরে আছে বনভূমি, ইচ্ছা করছিল ওখানেই থেকে যাই, যদিও গোটা বাড়িটায় কেউই ইংরেজি বা ফরাসি জানেনা। পুরপ্রধান, আমার বন্ধু, অবশ্য একজন অল্প ইংরেজিজানা তরুণীকে পাঠিয়েছিলেন, আর সে রাজি হল দিনে দুবার এসে আমার খোঁজ নিতে, কী লাগবে না লাগবে জেনে নিয়ে সে কথা গৃহকর্ত্রীকে জানানোর জন্য।

স্থানীয় ভাষা না জানাটা ছিল একটা চমৎকার অজুহাত আমার একা একা খাওয়ার জন্য, আর আমি ওদের খানিক বাধ্য করেছিলাম যে সেটা যাতে বেশ দেরি করেই করা যায়; সুইডেনে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে গিয়ে আমার পুরো দিনটাই ভণ্ডুল হয়ে যেত। ওখানে সেটা বদলাতে পারতামও না, যে পরিবারটিতে অতিথি হিসেবে ছিলাম তাদের খরচাপাতিতে প্রভাব না ফেলে; প্রয়োজনেই বাধ্য হয়েছিলাম একটি সাধারণ পরিবারের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে, সরাইখানায় থাকাটা এতটাই অসুবিধেজনক ছিল।

নরওয়েবাসের সময় ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম নিজের সময়টা নিজের মতো করে কাটানোর। আমি ঠিকই করেছিলাম যে এমনভাবে কাটাব যাতে ওদের সুন্দর গ্রীষ্মটাকে যথাসম্ভব উপভোগ করতে পারি; - স্বল্পকালীন, ঠিকই, কিন্তু "মধুর"।

এখানকার কর্কশ জলবায়ুতে শীত কাটাতে হয়নি আমাকে; তাই এটা ঠিক উল্টো অনুভূতি না, কিন্তু মরসুমের সত্যিকারের সৌন্দর্য এই গ্রীষ্মকে আমার কাছে এখনও অবধি যা দেখেছি তাদের সবার সেরা করে তুলেছিল। উত্তুরে আর পুবের হাওয়া থেকে আড়ালে, কোনওকিছুই যার থেকে স্বাস্থ্যকর হতে পারেনা, পশ্চিমী বায়ুর সেই নরম তাজা অনুভব। সন্ধ্যায় সেটাও পড়ে আসে; পপলারের পাতাগুলোর কাঁপুনি থেমে যায়, আর শান্ত প্রকৃতি যেন চন্দ্রালোকে উষ্ণ হয়ে ওঠে, এটা একটা আরামদায়ক রূপ নেয় এখানে; আর রোদ্দুর থাকতে থাকতেই এক পশলা হালকা বৃষ্টি হয়ে গেলে জুনিপার জঙ্গলের ঝোপঝাড় ছড়িয়ে দেয় বন্য সুবাস, তার সঙ্গে মিশে থাকে হাজার হাজার নাম না জানা সৌরভ, তা স্পর্শ করে হৃদয়কে, স্মৃতিতে এঁকে দেয় এমন এক ছবি যা কল্পনার কাছে মহার্ঘ হয়ে থাকবে চিরকাল।

প্রকৃতি হৃদয়াবেগের ধাত্রী - রুচির আসল উৎস - তবু কী দুর্গতি, আর উল্লাসই না হয় অপরূপ আর মহিমান্বিত কিছুকে দ্রুত প্রত্যক্ষ করলে - যখন পর্যবেক্ষণ করা হয় সজীব প্রকৃতিকে, যখন প্রতিটি রমণীয় অনুভব আর আবেগ উত্তেজিত করে সংবেদনশীল সহমর্মিতাকে, আর সমন্বিত হৃদয় ডুবে যায় বিষণ্ণতায়, বা মেতে ওঠে উচ্ছ্বাসে, তন্ত্রীতে ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে, এলোমেলো বাতাসে বীণার তারে আলোড়নের মত। কিন্তু কী বিপজ্জনক এইসব অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেওয়া অস্তিত্বের এরকম অসম্পূর্ণ দশায়, আবার কী কঠিন এগুলোকে নির্মূল করে ফেলা কারণ মানবাত্মার প্রতি অনুরাগ, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তীব্র আবেগ সবই আসলে সেই প্রেমেরই উন্মোচন যা ব্যাপ্ত করে থাকে যা কিছু মহান আর সুন্দর তাকে।

যখন উষ্ণ হৃদয় কোন কিছুতে প্রভাবিত হয়েছে, তাকে মুছে ফেলা উচিত নয়। আবেগ পরিণত হয় অনুভূতিতে, আর কল্পনা সতত পরিবর্তনশীল অনুভবগুলোকে স্থায়ী করে তোলে, সস্নেহে সেইসব স্মৃতিচারণ করার মাধ্যমে। একটা তৃপ্তির রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছাড়া যে দৃশ্যগুলো দেখেছি, তাদের কথা আমি ভাবতে পারি না, ভোলা যাবেনা কখনও সেগুলোকে, যে রূপ আমি অনুভব করেছি প্রতিটি স্নায়ুতে, তা আর কোনোদিনই পাবনা। সমাধিস্থ করা হয়েছে এক প্রিয় বন্ধুকে, আমার যৌবনের বন্ধু, তবু সে আমার সঙ্গেই আছে, আর আমি তার নরম মিষ্টি কূজন শুনতে পাই ঘরের কোণে গরম চুল্লির পাশে গেলে। নিয়তি আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে আরেকজনের থেকে, যার চোখের আগুন, শিশুসুলভ স্নিগ্ধতায় নম্র, এখনও আমার হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলে; এমনকী যখন এই প্রকাণ্ড খাড়াই পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি, এক প্রশান্ত আবেগে মগ্ন হয় আমার অন্তরাত্মা। আর হেসো না, যদি বলি যে, ভোরের গোলাপি আভা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে সঞ্চারের কথা, তা আমার অনুভূতিগুলোকে কখনোই সেভাবে মথিত করবে না, যদি না আমার সন্তানের গালদুটোতে তার পুনরাবির্ভাব হয়। ওর মিষ্টি লজ্জারুণ মুখকে আমি এখনও বুকে জড়িয়ে লুকিয়ে রাখতে পারি, আর ও তো এখনও এটা জিজ্ঞেস করার পক্ষে ছোটই যে কান্না পায় কেন, এতটাই একইরকমভাবে আনন্দে আর বেদনায়?

আর লিখতে পারছিনা এখন। কাল বলব টন্সবার্গের কথা।

অনুবাদ - 'আমাদের ছুটি'

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (অষ্টম পর্ব)

আগের পর্ব - কঠিন পথে গোমুখে

যমুনোত্রীর পথে - গোমুখ থেকে উত্তরকাশী

সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

আবার সেই কষ্টকর রাস্তা। এবার আবার সঙ্গে খাবার জলও নেই। লালবাবার ভিজিটিং কার্ডে কলকাতায় কখন, কোথায়, কোন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে - সব লেখা আছে। এরকম একজন মানুষকে একবার দেখতে না পাওয়ায়, মনে একটা দুঃখ নিয়েই ফিরতে হচ্ছে। ঠিক করলাম কলকাতাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। গতকাল এ রাস্তার শেষ অংশে খাড়া উতরাই নামতে হয়েছিল। বেশ আরামে, বিনা কষ্টে প্রায় ছুটেই নেমেছিলাম। আজ ওপরে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এর আগেও লক্ষ্য করেছি, নতুন কোন জায়গায় যাওয়ার সময় খুব কষ্টকর রাস্তাও খুব একটা কষ্টকর বলে মনে হয় না। অথচ ফিরবার সময় যেন আর হাঁটার শক্তি বা ইচ্ছা থাকে না। তখন যেন কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। মাধব আর দিলীপ অনেক এগিয়ে গেছে। আমি সেই বিপজ্জনক রাস্তাটার কয়েকটা ছবি তুলব ভেবে আস্তে আস্তে ওদের অনেক পিছনে পিছনে হাঁটছি। এইভাবে এক সময় সেই ধুলো-পাহাড়, যেখানে বড় বড় পাথর অনবরত নীচে নেমে এসে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ে, যেখানে আসবার সময় মাধবের কৃপায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি, সেই জায়গায় এসে পৌঁছলাম। দেখি মাধব ও দিলীপ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকার কারণ অন্য কিছু নয়, ওই সরু বিপজ্জনক রাস্তায়, লাইন দিয়ে পরপর এক পাল গরু হেঁটে চলেছে। বিপজ্জনক রাস্তাটার ওদিক থেকে এদিক পর্যন্ত, সারিবদ্ধ গরুর পাল। যাচ্ছে গঙ্গোত্রীর দিকেই। হয়তো চিরবাসা বা অন্য কোথাও যাবে। একেবারে পিছনে একটা লোক, সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। গরুগুলো একটুও এগোচ্ছে না। ওরা না এগোলে, আমাদের পার হয়ে যাবার উপায় নেই। একে অত্যন্ত সরু রাস্তা, তার ওপর গরুগুলো খাদ বাঁচিয়ে, ধুলো পাহাড় ঘেঁসে যাচ্ছে। ওদের পাশ দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হলে, খাদের দিক দিয়ে যেতে হবে। এদের চরিত্রও সঠিক জানা নেই। একটু ঠেলে দিলে একবারে সোজা গঙ্গায় চলে যাব। গরুর মালিক ও বাচ্চা ছেলেটা আমাদের পাশ থেকে একেবারে সামনের গরুগুলোর দিকে পাথর ছুঁড়ছে। পাথরের আঘাতে বা ভয় পেয়ে সামনের গরু একটু এগোলে গোটা লাইনটা এগোবে। এই চেষ্টাতেও তেমন লাভ কিছুই হচ্ছে না। ভাবলাম, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, জীবনে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। এ যেন মহাত্মা গান্ধী রোডের জ্যামে দাঁড়িয়ে - বাসে করে কলেজ স্ট্রিট যাচ্ছি। লোকটা অভয় দিয়ে বলল, গরুগুলো খুব শান্ত, কোন ভয় নেই। পাশ দিয়ে চলে যেতে পারেন। অথচ সে নিজে বা তার চেলা, কেউ কিন্তু গরুগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, ওদের তাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে না। ওর কথাটা "মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না - জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতই না" গোছের সান্ত্বনা বাক্য বলে মনে হল। ভয় হচ্ছে এত ধীর গতিতে গরুগুলোর পিছন পিছন বা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে, গরুগুলো কিছু না করলেও, গতকালের মতো পাথর নেমে আসলে কী করব? ছুটে পালাবার উপায়ও তো থাকবে না। শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় না দেখে, বাধ্য হয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। প্রথমে আমি, তারপর দিলীপ, সব শেষে মাধব। খাদের দিক দিয়ে গেলাম না। গরুগুলোর পিঠে চড় চাপড় মেরে, ডানপাশ দিয়ে, অর্থাৎ ধুলো-পাহাড়ের ধার ঘেঁসে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চললাম। গরুগুলো সত্যিই খুব শান্ত ও ভদ্র। আমাদের এগিয়ে যাবার রাস্তা না দিলেও, আক্রমণ করার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করল না। এরমধ্যে আবার নতুন এক বিপদ দেখা দিল। একটা গরু হঠাৎ কিরকম ভয় পেয়ে, খাদের দিকে খানিকটা কাত হয়ে নেমে গেল। খাদে তলিয়ে গেল না। অসহায় ভাবে রাস্তায় উঠে আসার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হাঁচোড়-পাঁচোড় করে রাস্তায় উঠে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পা পিছলে যাওয়ায়, উঠে আসতে পারছে না। পিছন থেকে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিল। ভয় হল গরুটা তলায় চলে গেলে, তার দায় না আবার আমার ওপর বর্তায়। যাহোক, শেষ পর্যন্ত গরুটা সম্পূর্ণ নিজের একক চেষ্টাতেই, রাস্তায় উঠে আসতে সক্ষম হল। আমরা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়ে আবার এগিয়ে চললাম।

বেশ কিছুটা রাস্তা পার হয়ে দেখলাম, স্থানীয় একটা ছেলে ঝরনার পাশে পাথরের ওপর বসে কাপড় কাচছে। আমরাও ঝরনার পাশে বসে, গতকালের সঙ্গে আনা পুরি আর খেজুর খেলাম। সাত সকালে একদিন আগেকার তৈরি ঠাণ্ডা, শক্ত পুরি খেতে ইচ্ছা করছে না। যে ছেলেটা কাপড় কাচছে, তাকে খানিকটা দিতে গেলে, বলল খাবে না। কী আর করব, ছুঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই পাথর ফেলা জায়গাটায় এসে হাজির হলাম। এখানেই গতকাল রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পাথরগুলোর পিছন দিক দিয়ে পরিস্কার রাস্তা ধরে ব্রিজে এসে উঠলাম। এখান থেকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করলাম যে কিভাবে যাবার সময়, রাস্তা হারিয়ে গোলোকধাঁধায় ঘুরছিলাম। একসময় চিরবাসার সেই টিনের ছাদের ঘরটা চোখে পড়ল। আজকেও বেশ পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর রোদ উঠেছে।। খুব ভাল করে আগের দিনের দেখা তারার মতো জিনিসটা খুঁজলাম। গতকাল আর আজকের আবহাওয়া প্রায় একই রকম। আকাশের অবস্থা, সূর্যালোকও প্রায় একই রকম, এমন কী সময়টা এক না হলেও প্রায় কাছাকাছি, অথচ আজ কিন্তু তারাটা কোথাও দেখা গেল না। মনে মনে কিভাবে লঙ্কা থেকে ভুখি, এই মরণ ফাঁদ থেকে বার হব, সেই চিন্তা করতে করতে পথ চলছি। চিরবাসার খুব কাছে এসে, ডানপাশে লাল রঙে "VIMAL" লেখা বড় পাথরটা চোখে পড়তে দিলীপকে বোতলটা বার করে আনতে বললাম। বলল, আগেই কাজটা সেরে রেখেছে। ওটাকে ব্যাগে ভালভাবে সোজা করে রেখে দিলাম। কাঁধের ব্যাগটা এখন বেশ ভারি বলে মনে হচ্ছে। কাঁধে যেন চেপে বসে যাচ্ছে। ওরা আবার এগিয়ে গেছে, আমি ধীরেসুস্থে পথ চলছি। তাড়াতাড়ি হাঁটতে গেলে বোতলটা কাত হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ছবি তোলা আছে। একসময় ওদের আর চোখে না পড়ায়, বাধ্য হয়ে জোরে পা চালালাম। এঁকেবেঁকে বিপজ্জনক সরু রাস্তা পার হয়ে, একসময় মাধবের সঙ্গে দেখা হল। আমরা দুজনে এবার একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। দিলীপ এগিয়ে গেছে। রাস্তা আর শেষ হয় না। এইভাবে একই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে, একসময় পুলিশ স্টেশনের কাছে এসে হাজির হলাম। পুলিশের দুজন লোক আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "ফিরে এসেছেন? তিনজনেই এসেছেন তো?" জানালাম, আমরা তিনজনই ভালভাবে ফিরে এসেছি। বললেন, "বাঁচা গেল" - যেন একটা বড় চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেলেন। নীচে নেমে এসে, সেই চায়ের দোকানে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম, সঙ্গে ঝুড়িভাজা।

কয়েকজন বেশ ভাল চেহারার যুবক এল। থাকে হরিদ্বার। ওখান থেকে হেঁটে গঙ্গোত্রী এসেছে। আগেও নাকি একবার হেঁটে কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-গোমুখ-যমুনোত্রী গিয়েছিল। এবার কয়েকজনের সামনে পরীক্ষা থাকায়, অন্য কোথাও যাবে না। জানালাম, আমরা এইমাত্র গোমুখ থেকে ফিরছি। যাহোক, চা খেয়ে দিলীপ ও মাধব গেল জীপ এসেছে কিনা খোঁজ করতে। জীপ এখান থেকে কিছুটা রাস্তা আগে দাঁড়ায়। দোকানদার বলল, "গতকাল ভোরে জীপ একবার এসেছিল। তারপর থেকে জীপ আর আসে নি। আজ হয়তো আসতে পারে। প্রায় প্রতিদিনই জীপটা আসে"। রামজীকে কোথাও দেখলাম না। মাধবরা ফিরে এসে খবর দিল, জীপ আসেনি। মাধব বলল, জীপের জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আর দিলীপ, দুজনেই হেঁটে যাবার পক্ষপাতী। কারণ আজ যদি লঙ্কায় ডাবরানী থেকে বাস আসে, তবে সেটা ধরতেই হবে। কবে আবার দয়া করে আসবে বলা যায় না। মাধবের দেখলাম হেঁটে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই নেই। আমাদেরও যে হাঁটতে খুব ভাল লাগছে তা নয়, তবু আজ বাস এলে সেটা ছেড়ে দেওয়া কোনমতেই উচিত হবে না। দুদিন আগে আমরা বাসে লঙ্কায় এসেছিলাম। কাজেই গতকাল না এলেও, আজ লঙ্কায় বাস আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সবে প্রায় সতের কিলোমিটার পথ হেঁটে এসেছি। কিন্তু সবদিক চিন্তা করে, শেষ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াই স্থির হল। ঠিক করলাম রাস্তায় জীপ আসতে দেখলে, তাতেই চলে যাব। আস্তে আস্তে লঙ্কার দিকে পা বাড়ালাম।

হাঁটতে আর ভালো লাগছে না। আগেও শুনেছি, এবার রাস্তাতেও শুনলাম, যমুনোত্রীর প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি মোটেই সুন্দর নয়। কিছুই দেখার নেই। বোধহয় তাই যমুনোত্রীর জন্য কষ্ট করতে আরও ভাল লাগছে না। বন্ধুদের মানসিক অবস্থা পরখ করবার জন্য বললাম, সবাই বলছে যমুনোত্রীতে দেখার মতো কিছুই নেই, তাই ওখানে যেতে চায় কী না। আশ্চর্য, এবার কিন্তু দুজনেই, যমুনোত্রী যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। মনে মনে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। তবে জানিনা এই ফাঁদ থেকে বেরোবার পর ওরা তো দূরের কথা, আমার নিজেরই কতটা ক্ষমতা বা ইচ্ছা থাকবে, যমুনোত্রী দেখার! প্রায় দশ কিলোমিটার পথ হাঁটলে, ভৈরবঘাঁটি চড়াই পৌঁছব। কয়েকজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও দেখলাম হেঁটে চলেছে। লঙ্কাগামী রাস্তা পাকা, তার ওপর খুব একটা উতরাই না হলেও, চড়াই নয়। হাঁটার কষ্ট অনেক কম। তবু সতের কিলোমিটার পথ হেঁটে এসে, নতুন করে দশ কিলোমিটার এই পথ, তা যতই ভাল রাস্তা হোক, হাঁটতে বেশ কষ্টই হচ্ছে। ভৈরবঘাঁটি থেকে লঙ্কা আবার প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পার হতে হবে। আসবার সময় ওই পথে আসতে কষ্ট হয়েছে ঠিক, কিন্তু ফিরবার সময় মৃত্যুযন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। রাস্তা এবার সোজা ওপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। দিলীপ একটু এগিয়ে গেছে। আমি আর মাধব খুব আস্তে আস্তে, গল্প করতে করতে চলেছি। এ রাস্তায় জীপ যায়, কাজেই বিপদের সম্ভাবনা প্রায় নেই। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে ডানপাশে, ওপর থেকে একটা বড় ঝরনা নেমে এসেছে। সঙ্গে তিন-তিনটে ওয়াটার বটল থাকলেও, সবকটাতেই গোমুখের পবিত্র গঙ্গাজল ভরে আনা হয়েছে। এপথে জলের কষ্ট খুব একটা হবে না। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে, ডাবরানী থেকে ভুখি পর্যন্ত জল ছাড়া যাব কী ভাবে? আসবার সময় তিনটে ওয়াটার বটল সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, জল ভরে না নিয়ে আসার জন্য, প্রচণ্ড জলকষ্টে ভুগেছি। আট কিলোমিটার হাঁটা-পথের দুই প্রান্তে দুটো ঝরনা। ফিরবার সময় ওয়াটার বটল সঙ্গে থাকলেও, খাবার জল ভরে নিয়ে যাবার উপায় নেই। এখানে এখন নতুন কোন ওয়াটার বটল কিনতে পাওয়াও যাবে না। সঙ্গী দুজনকে বললাম, একটা বটল খালি করে ঝরনার জল ভরে নেব। যমুনোত্রী থেকে বটলটায় যমুনার জল ভরে নেওয়া যাবে। ওরা যমুনার জল বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হল না। তিনটে বটলেই গোমুখের জল ভরে নিয়ে যেতে চায়। অগত্যা আকণ্ঠ ঝরনার জল পান করে, এগিয়ে চললাম। বাঁপাশে গভীর খাদ - মাঝেমাঝে মাইল স্টোন। প্রতি কিলোমিটার রাস্তাকে, পাঁচ ভাগে ভাগ করে করে মাইল স্টোনগুলো রয়েছে। যেমন, ভৈরবঘাঁটী ৯ কিলোমিটার। এরপর ২/৯, ৪/৯, ৬/৯, ৮/৯। তারপর ভৈরবঘাঁটী ৮ কিলোমিটার। একটা মাইল স্টোন পার হয়ে কখন দুই দেখব, তারপর চার দেখব, তারপর কখন ছয় দেখব, এই আশা নিয়ে ক্রমে এগোতে লাগলাম। মনে হয় এই আশায় আমাদের হাঁটার গতিও অনেক বেড়ে গেল,অপর দিকে হাঁটার কষ্টও কিছু লাঘব হল। "ধন্য আশা কুহকিনী"। আহা এই সময় যদি সুকুমার রায়ের "খুড়োর কল" একটা সঙ্গে থাকত, তাহলে কত সুবিধাই না হত।

রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও কোনও লোকজন নেই। সুন্দর সবুজ গাছপালা দিয়ে সাজানো নীচের খাদ যেন সেজেগুজে তার রূপ প্রদর্শন করছে। দিলীপ পাকা রাস্তা পেয়ে, বার বার অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার যেন আর শেষ নেই। এতদূর চলে এলাম, এখনও পর্যন্ত জীপটা ওদিক থেকে এল না! অপেক্ষা না করে হেঁটে যাব স্থির করেছিলাম বলে বেঁচে গেলাম। কবে যে ওটা আবার গঙ্গোত্রী আসবে ভগবান জানেন! কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তার একপাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ওঁরাও লঙ্কার দিকেরই যাত্রী। আমরা না থেমে, পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দিলীপকে দেখা যাচ্ছে না। ও বোধহয় সোজা পাকা রাস্তা পেয়ে, লাগাম ছাড়া হয়ে ছুটছে। রাস্তার উভয় পাশেই, নতুন কোন দৃশ্যও চোখে পড়ছে না। একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্য দিকে খাদ। কিন্তু সবুজ বনজঙ্গলে ঢাকা খাদ এখানে খুব গভীর নয়। রাস্তায় এমন কেউ নেই, যার কাছে নতুন কোনও খবর পাওয়া যায়, পাওয়া যায় একটু উৎসাহ। একমাত্র রাস্তার মাইল স্টোনগুলো ভৈরবঘাঁটি থেকে তাদের নিজ নিজ দূরত্ব জানিয়ে যেন ইশারায় আমাদের বলছে, জোরে, আরও জোরে, আর বেশি পথ নেই। ওগুলোর ওপর চোখ পড়লে যেন নতুন করে উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আর সামান্য কয়েকটা দিন কষ্ট করলেই আমাদের দীর্ঘদিনের মনস্কামনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব। বাঁপাশে রাস্তা থেকে একটু নীচে, একটা দোকান চোখে পড়ল। ওখান থেকেই আসবার সময় জীপ ছেড়ে ছিল। ওটাই ভৈরবঘাঁটি, পাশেই মন্দির। গতি বেড়ে গেল। অনেকটা পথ ঘুরে ওখানে যেতে হবে। মাধবকে বললাম রাস্তার পাশ দিয়ে, ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে, সাবধানে নেমে আসতে। পা পিছলে যাচ্ছে, পড়ে যাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। পড়ে গেলে হাত পা কেটে ছড়ে যাবে। কোনমতে দুজনে ওপর থেকে শর্টকাটে নেমে এসে দোকানে ঢুকলাম। দিলীপ আগেই চলে এসেছে। দোকানে চা, বিস্কুট দিতে বললাম।

সকাল থেকে একভাবে হেঁটে আসছি। প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ কিলোমিটার পথ হেঁটে এখানে এসেছি। এখন পর্যন্ত পেটে একটু ঝুড়িভাজা, একটা ঠাণ্ডা শক্ত পুরি, খান তিন-চার খেজুর আর দুকাপ চা পড়েছে। খিদেও পেয়েছে খুব। তবে আমার মাথায় এখন ওর থেকেও অনেক বড় চিন্তা, আজ লঙ্কা থেকে ডাবরানী যাবার বাস পাওয়া যাবে তো? এই দোকানে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। থাকেন দেরাদুনে। ওখানেই ব্যবসা করেন। সময় পেলেই সোজা গঙ্গোত্রী চলে আসেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হাওড়া ফেরার জন্য দুন এক্সপ্রেসে সহজে রিজার্ভেশন পাওয়ার জন্য, কোথায় যাওয়া ঠিক হবে - হরিদ্বার, না দেরাদুন? ভদ্রলোক বললেন, হরিদ্বার গেলে পেয়ে যাবেন। দেরাদুন থেকে তো অবশ্যই পাবেন, কারণ মুসৌরিতে এখন খুব কম ট্যুরিষ্ট। ভরা সিজনেও টুরিষ্টের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। কারণ মাদকবর্জন আইনে মুসৌরিতে সরাব বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভ্রমণার্থীর ভিড় একবারে নেই। যে কোন হোটেলে বেশ সস্তায় ঘর পাওয়া যায়। হোটেলওলাদের মনে তাই প্রচণ্ড ক্ষোভ। ঠিক করলাম, যমুনোত্রী হয়ে সোজা হরিদ্বার চলে যাব। ওখান থেকেই ফেরার টিকিট কাটা যাবে। কয়েকদিন নির্ভেজাল বিশ্রাম নিয়ে, একটু চাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফেরা যাবে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, আগে তো লঙ্কা পৌঁছই।

কাঁধের ঝোলা নিয়ে রাস্তায় নামলাম। লঙ্কা থেকে ভৈরবঘাঁটি আসার সময় আমাদের খুব একটা কষ্ট হয়নি। আসবার সময় ভৈরবঘাঁটির কাছাকাছি বেশ কিছুটা রাস্তা নেমে এসেছিলাম। রাস্তাটা সিমেন্ট দিয়ে একটু পাকা করা হয়েছে। বেশ কিছু চওড়া চওড়া সিঁড়িও আছে। এবার সেগুলো ভেঙে ওপর দিকে উঠতে হবে ভাবতেই, বুকের ভিতর কেমন একটা শিরশির করে উঠল। হাঁটার গতিও বেশ কমে গেছে। সঙ্গীদের বললাম একটু জোরে পা চালাতে। এত কষ্টের শেষে বাস ধরতে না পারলে, আফসোসের আর সীমা থাকবে না। মাধব সরাসরি জানাল যে, ওর পক্ষে আর জোরে হাঁটা সম্ভব নয়। আমি আর দিলীপ এগিয়ে গেলাম। মাধব ধীরে ধীরে পেছনে আসছে। এবার একটা ব্রিজ পার হয়ে এলাম। এখানে ডানদিক থেকে একটা নদী এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। শুনলাম আগে এখানে এত ভাল ব্রিজ ছিল না। যদিও এখনও এটা একটা কাঠের তৈরি ব্রিজ, তবে বেশ চওড়া ও মজবুত। আগে নাকি লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, গাছের ডাল ফেলে এখানে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছিল। দুটো নদীরই প্রকৃতি এখানে খুব একটা অশান্ত নয়, তবু নীচে তাকালে কিরকম একটা গা ছমছম করে। জানতে পারলাম, ডানদিকের নদীটাকে 'নীলগঙ্গা' বলা হয়। কেউ কেউ আবার 'জাহ্নবীগঙ্গা'ও বলে। যেদিক থেকে নদীটা এসেছে, সেদিকের বাসিন্দারা ওটাকেই আসল গঙ্গা বলে দাবি করে। নদীটার জল গঙ্গার তুলনায় বেশ পরিষ্কার ও নীলচে। আমরা ধীরে ধীরে, দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে আর জানতে জানতে পথ চলছি। এই দু-তিন কিলোমিটার রাস্তার পরেই, আজকের মতো বিশ্রাম। অবশ্য যতক্ষণ না ডাবরানী যেতে পারছি, ততক্ষণ এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি পাব না। আমরা এখানকার পরিবহণ ব্যবস্থার হাতের পুতুল। এখানেও দেখছি কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। নিজের মুখ আজ প্রায় দিন পনের হল দেখার সৌভাগ্য হয়নি। হাত-পায়ের রঙ দেখে বেশ বুঝতে পারছি, শ্রীমুখের অবস্থা কী হতে পারে। পথে বসে থাকা এই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে ক্লান্তির ছায়া। ওঁদের মুখমন্ডলকে আয়না হিসাবে ধরে, বুঝতে পারছি আমাদের এই অবসাদ, এই নিরুৎসাহ ভাব, অস্বাভাবিক কিছু নয়। লঙ্কার যত কাছাকাছি আসছি, গতি যেন তত কমে আসছে। শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে লঙ্কার সেই পুরানো মিষ্টির দোকান-কাম-হোটেলে এসে বেঞ্চে বসে পড়লাম। প্রথমেই খবর নিলাম, আজ বাস এসেছিল কী না। দোকানদার বলল, গতকাল বা আজ কোন বাস ডাবরানী থেকে লঙ্কায় আসে নি। মনে একটাই সান্ত্বনা, এখান থেকে একটাও প্যাসেঞ্জার না পেলেও বাস এলে আবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাবরানী ফিরে যাবে।

বিকেল তিনটে বাজে। দোকানে এখন আর কোন খাবার পাওয়া যাবে না। সারাদিনের শেষে প্রধান খাদ্য আবার সেই ঝুড়িভাজা ও চা। বসে বসে কোমর ব্যথা হয়ে গেল। বাস বোধহয় আজ আর আসবে না। হয়তো এদিকের লোকেদের এখন ময়দা, ডালডা ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি বাস আসার সম্ভাবনা ক্রমশঃ কমে আসছে। বন্ধুরা দোকানেই বসে রইল। আমি যেদিক থেকে বাস আসবে, রাস্তা ধরে সেদিকে অনেকটা পথ এগিয়ে

গেলাম। হঠাৎ মনে হল দূরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে, একটা হর্ণের আওয়াজ এল। কান খাড়া করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে বেশ ফুর্তি হচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আর কিছু শুনতে না পেয়ে বুঝলাম, সারাক্ষণ বাসের চিন্তা আমায় পাগল করে ছেড়েছে। আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে দোকানে ফিরে এলাম। ওদের বাসের হর্ণের কথা বললাম। হঠাৎ আবার সেই হর্ণের আওয়াজ শুনলাম মনে হল। এবার ওরাও আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলাম, ওরাও একই রোগের রোগী। এবার তিনজনেই একসঙ্গে ভুল শুনেছি। এরমধ্যে আবার দোকানদার বলল, তার কপালে খুব যন্ত্রণা করছে, আমরা কোন ওষুধ দিতে পারব কিনা। এখন নাহয় ঝুড়িভাজা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু রাতে থাকতে হলে, এই দোকানদার ছাড়া গতি নেই। ওর সুস্থ থাকা আমাদের থেকেও বেশি জরুরী। বিজ্ঞ ডাক্তারের মতো জিজ্ঞাসা করলাম, জ্বর আছে? হাতটা ধরে নাড়ি দেখার ভান করে, তাকে একটা স্যারিডন ট্যাবলেট দিয়ে খেয়ে নিতে বললাম।

মাধব তিতিবিরক্ত হয়ে বলল, বাসের দরকার নেই, চল ট্রাভেলার্স লজ বুক করি। একটু শুয়ে থেকে বিশ্রাম নেওয়া যাক। আমি বললাম, সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত দেখবো। ক্লান্তি আমারও খুব কম লাগছে না। তবে এখনই ঘর বুক করা বোকামি হবে, কারণ দেখা যাবে ঘরও বুক করলাম, আর বাসও এসে হাজির হল। ও আর কথা বাড়াল না। আর এক দফা চা খেয়ে, দোকানের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দোকানটার সামনে বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা, বাসের অপেক্ষায় বসে আছে। একপাশে পরপর দুটো কুঁড়েঘরের মতো, তার মধ্যেও অনেকে একই উদ্দেশ্যে বসে আছে। গতকাল থেকেই হয়তো ওরা এখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। যে দোকানটায় বসেছিলাম,তার ভিতরে একটা কাঠের মাচায় কম্বল পেতে দুজন শুয়ে আছে। পোশাক দেখে মনে হল, ওরাও বাসে যাবে এবং গতকাল এখানেই রাত কাটিয়েছে। এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে, স্থানীয় কিছু যুবক এল দোকানে আড্ডা মারতে। হঠাৎ তীব্র একটা হর্ণের আওয়াজ। নাঃ, এবার আর কোন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। উঃ! সে যে কী আনন্দ হল,ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। মরণফাঁদ থেকে উদ্ধার করার জন্য, রথ এসে হাজির। এবার মনে হচ্ছে, আগের দুবার এই বাসেরই হর্ণের আওয়াজ শুনেছিলাম। পথে থেমে থেমে,লোক নামিয়ে আসতে এত সময় নিল। বাসটা এসে লোক নামিয়েই ফিরে যাবার জন্য ডাবরানীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আমি মহানন্দে ছুটে গিয়ে ড্রাইভারের হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাস আজ যাবে তো?" ড্রাইভার জানাল, একটু পরেই বাস ডাবরানী ফিরে যাবে। একেবারে সামনে জানালার ধারে আমাদের জায়গা রেখে, নিচে নেমে দোকানে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, দেখি গোটাকতক মিলিটারি এসে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। একটু পরেই জানা গেল, মিলিটারিরা বলেছে আগামীকাল সকালে হরশিল থেকে ওদের ক্যাম্পের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মিলিটারির একটা দল, ডাবরানী যাবে। কাজেই এই বাস যেন কাল সকালে ছাড়ে। সকলের সব অনুরোধকে উপেক্ষা করে, ড্রাইভার ঘোষণা করল, বাস আজ আর যাবে না, কাল ভোরে বাস ছাড়বে। ব্যস, হয়ে গেল - বাড়া ভাতে ছাই। বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম, "কাল সকালে কি বাস হরশিল গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? কখন মিলিটারিরা আসবে তবে বাস ছাড়বে?" ড্রাইভার বলল, "ওরা খুব ভোরে তৈরি হয়েই থাকবে। হরশিল পৌঁছালেই বাসে উঠে পড়বে।" ড্রাইভারের কথা বলার ধরণ দেখে মনে হল, এ ঘটনা এখানে আখছারই ঘটে এবং বাস নিয়ে আজ ডাবরানী ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা বা সাহস, কোনটাই তার নেই।

হায়! বহু আকাঙ্খিত রথ হাতে পেয়েও, সব হারালাম। ওদের জন্য বাস যদি দেরিতে ডাবরানী পৌঁছয়, তবে কাল আর এগনো যাবে না। রাতে আবার বুদ্ধি সিং-এর তাঁবুতেই থাকতে হবে। কিন্তু কিছু করারও নেই। সেই ট্রাভেলার্স লজেই একটা ঘর বুক করলাম। ঘরটায় চারটে বেড, কুড়ি টাকা ভাড়া লাগবে। প্লাইউডের দেওয়াল, অ্যাটাচ বাথ। বেশ ভালই ব্যবস্থা, তবে সবই অসমাপ্ত। গত বছর বন্যার আগে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বন্যার পর যাত্রী আসার সম্ভাবনা না থাকায় কাজও বন্ধ হয়ে আছে। তাছাড়া উত্তরকাশীর সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় মালপত্র নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। অর্ধেক তৈরি অ্যাটাচ বাথটা এখন স্টোর রুম। ভাবলাম, একটা বেডকে টেনে এনে দরজার সঙ্গে চেপে পেতে দেব। কেয়ারটেকার পরামর্শ দিল, দরজা ও দেওয়ালের প্লাইউডের ফাঁকে ছোট একটা পাতলা কাঠের টুকরো গুঁজে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে, তাহলে দরজা সহজে খুলবে না। ঠিক করলাম, দুরকম ব্যবস্থাই করব। ঘরভাড়া কাল সকালে যাবার সময় দিলেই হবে। ঘরে ঢুকে একটা হ্যারিকেন দিতে বলে, তিনজন তিনটে খাটে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। এত ক্লান্তিকর দিন, এর আগে বোধহয় কাটাতে হয় নি। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে, মালপত্র ঘরে রেখে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে দোকানে ফিরে এলাম। বৃদ্ধ দোকানদারের সঙ্গে দেখা হতে, দুহাত তুলে নমস্কার করে 'ডাগতার সাব' বলে সম্বোধন করে জানালেন, তাঁর কপালের যন্ত্রণা একদম কমে গেছে। রাতের খাবারের অর্ডার দিলাম। আজও সেই আলুর তরকারি আর রুটি। এখানে অবশ্য তরকারিটা একটা প্যানে, কাঠের আগুনে বসিয়ে, একটু নেড়েচেড়ে বেশ ঘন করা হয়। এরা এটাকে সবজি ফ্রাই বলে। রুটিগুলো একটু পাতলা পাতলা করে করতে বলে, তরকারিটা ফ্রাই করে দিতে বললাম। দোকানটায় এখন অনেকগুলো যুবকের ভিড়। দেখে স্থানীয় বলেই মনে হল।

যে বাসটা এসেছিল, সেটা দেখি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। খুব চিন্তায় পড়লাম। আর হয়তো দু-চার দিনের মধ্যে কোন বাসের টিকি দেখা যাবে না। এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ রাতেই আবার ফিরে আসবে। রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করার সময় একজনের পায়ে একটা বড় পাথর পড়ে গেছে। বাসটা তাকে হরশিল পৌঁছে দিয়ে আবার এখানে আসবে। খুব ভাবনা হল, সত্যি কথা বলছে তো? বাস সোজা ডাবরানী চলে যাবে না তো? যাহোক, সঙ্গে নিয়ে আসা মাখন দিয়ে, যদিও তারও অবস্থা আমাদেরই মতো কাহিল, সবজি ফ্রাই আর রুটি খেয়ে, ক্লান্ত দেহে, লজে ফিরে এলাম। কত রাত জানিনা, বাসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারলাম, বাসটা কথামতো ফিরে এল। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

পয়লা সেপ্টেম্বর। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে, একেবারে সামনের সিটে ও ঠিক তার পিছনের দুজন বসার চেয়ার সিটে নিজেদের জায়গা রেখে এসে, দোকানে গেলাম। মাধব চা খেয়ে, দোকানের টেবিলের ওপর মানিব্যাগটা রেখে, আমাদের দাম দিয়ে দিতে বলে, একটু দূরে প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে চলে গেল। দোকানে স্থানীয় যুবকদের ভিড়। আমি চা খেয়ে, দিলীপকে দাম দিয়ে দিতে বলে একই উদ্দেশ্যে এগোলাম। অনেকক্ষণ পরে দিলীপ এসে বলল, "তোরা টাকা দিয়ে আসিসনি বলে চায়ের দাম দিতে পারলাম না।" শুনে তো আমার মাথা ঘুরে গেল। ও আসার পর, অন্তত দশ-পনের মিনিট কেটে গেছে। এতক্ষণে মানিব্যাগ নিশ্চয় অন্য কারো পকেট সঙ্গী হয়ে গেছে। দিলীপকে বললাম ছুটে দোকানে গিয়ে বেঞ্চের ওপর দেখতে। ও চলে গেল। ব্যাগে প্রায় শ'চারেক টাকা তো ছিলই। একটু পরে দিলীপ ফেলে আসা মানিব্যাগ হাতে নিয়ে ফিরে এল। ঠিক কত টাকা ছিল, এখনই বলা সম্ভব নয়, তবে মনে হল টাকা পয়সা ঠিকই আছে। কেউ হাত দিলে সবটাই নিয়ে নিত, কয়েকটা নোট বার করে নিত না। অথচ ব্যাগটা মাধব যেখানে রেখে এসেছিল, দোকানদার ও ওই যুবকদের চোখ পড়তে বাধ্য। দিলীপ বলল, দোকানে এখনও সবাই বসে গল্প করছে। ও দোকানের বেঞ্চের ওপর থেকেই ব্যাগটা নিয়ে এসেছে। এদের সততা, আমাদের অসততা কমাতে পারল না, এটাই দুঃখ। যাহোক ঘর থেকে ব্যাগ, লাঠি, ওয়াটার বটলগুলো নিয়ে এসে, বাসে উঠে বসলাম। কেয়ারটেকার এসে ভাড়ার টাকা নিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বাসও ছাড়ল। কিন্তু এ ওঠে তো সে ওঠে না, ফলে বারবার বাস দাঁড় করাতে হচ্ছে। ড্রাইভারও বিরক্ত হচ্ছে। বাসে অল্প কয়েকজন মিলিটারিও আছে। অবশেষে বাস সত্যিই ছেড়ে দিল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হরশিল এসে পৌঁছল। রাস্তার বাঁপাশে মিলিটারি ক্যাম্প। ওরা তৈরি হয়েই ছিল। নানা আকারের বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাসের ভিতরে ও ছাদে চটপট উঠে পড়ল। দেখলাম সঙ্গে মদের বোতল, রেডিও ইত্যাদিও আছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাম্প প্রায় ফাঁকা। কোথায় যাবে জানিনা, তবে এখানে বোধহয় একসঙ্গে অনেকদিনই ছিল, কারণ যে দুচারজন গেল না, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে এবং মনে হল তাদের চোখে জল। বাস ছেড়ে দিল। ওরা কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি করল না। আমরা আগের মতোই বেশ আরামে বসে আছি। একটু এগিয়েই রাস্তার ডানপাশে দেখলাম, গতকালের আহত ছেলেটাকে, একটা গাছের ডাল কেটে তৈরি স্ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। জানালা দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওকে এই বাসে ডাবরানী নিয়ে যাবার জন্য ওর কয়েকজন সঙ্গী ড্রাইভারকে অনুরোধ করল। ড্রাইভার জানালো, আহত ছেলেটাকে বাসে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না, শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে। অথচ বাসের ভিতরে ও ছাদে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, যেখানে তাকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ড্রাইভার আশ্বাস দিল, ডাবরানী পৌঁছেই, হয় সে নিজে বাস নিয়ে ফিরে আসবে, নাহলে অন্য কাউকে বাস নিয়ে পাঠাবে, আহত যুবকটিকে ডাবরানী নিয়ে যাবার জন্য। বাস ছেড়ে দিল। স্বার্থপর আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

একটু এগোতেই এক সাধু হাত দেখিয়ে বাস দাঁড় করালেন। দেখেই চিনতে পারলাম। বাসে উঠে উনি আমাদের একেবারে কাছে এসে দাঁড়াতেই ওদিকের একজন একটু সরে বসে তাঁকে বসবার জায়গা করে দিল। আমি আমার বিশুদ্ধ হিন্দিতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, আপ্ কি, মানে....।" মাধব বলল, "তোর হিন্দি বুঝবেন না, বাংলাতেই জিজ্ঞাসা কর।" আমি আবার বললাম, "আচ্ছা, আপ্ কি..." সাধু আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই ভাঙা ফ্যাঁসফেসে গলায় বাংলায় বললেন, "ভুজবাসার লালবাবা। তা তোরা তো তিনজনে গিয়েছিলি?" আমরা দিলীপকে দেখালাম। আসলে ভুজবাসায় লালবাবার ছবি দেখায়, তাঁকে চিনতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। লালবাবা এবার জাপানি ছেলেটা আশ্রমে উঠেছিল কিনা, আশ্রমে আমাদের কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন শুরু করে দিলেন। বুঝলাম ভুজবাসা থেকে আসার সময় তিনি গঙ্গোত্রীতে, কজন যাত্রী গোমুখ গেছে বা যাবে, তারা কোথা থেকে এসেছে, সমস্ত খবরাখবর নিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল তাঁর আশ্রম থেকে সকালে ফিরে আসার সময় আমরা রুটি খেয়ে এসেছিলাম কিনা। বললাম, শুধু চা খেয়েই আমরা বেড়িয়ে ছিলাম। তিনি শুনে বললেন - "খুব অন্যায় করেছিলি, ওপথে খালি পেটে হাঁটতে নেই। তার

মানে সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি?" বাধ্য হয়ে বলতেই হল, বিকেলবেলা লঙ্কা পৌঁছে ঝুড়িভাজা খেয়েছিলাম। রাতে রুটি তরকারি। উনি আবার বললেন, "খুব অন্যায় করেছিস।" ভাবলাম, এর নামই বোধহয় মানব সেবা। লালবাবা না থাকলে যে নিশ্চিন্তে গোমুখ দেখার সুযোগ কারো ভাগ্যে জুটত না, অন্তত আমাদের মতো সহায়-সম্বলহীন, তাঁবুহীন যাত্রীদের পক্ষে, এটা বোধহয় বলাই যায়। অথচ গঙ্গোত্রীতে এবং লঙ্কাতেও দেখলাম, দোকানের সবাই, বিশেষ করে স্থানীয় পান্ডারা, লালবাবাকে নিয়ে কী ঠাট্টা-বিদ্রূপই না করে। হয়তো লালবাবার নিঃস্বার্থ মানব সেবা, স্বার্থান্বেষী পান্ডাদের যাত্রীদের নিয়ে রমরমা ব্যবসার প্রধান অন্তরায়, তাই এত ঈর্ষা, তাই এত বিদ্রূপ। তাঁকে আশ্রমের পথে দেখা তারার কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তোরা দেখেছিস? খুব পরিষ্কার আকাশ থাকলে দিনের বেলায় ওটা দেখতে পাওয়া যায়। বললাম, ফেরার পথে প্রায় একই রকম পরিষ্কার আকাশেও ওই তারাটা দেখতে পাইনি। লালবাবা বললেন, ওটার নাম 'পুচ্ছল'। রোজ দেখা যায় না। খুব পরিষ্কার আকাশ থাকলে, মাঝে মাঝে দেখা যায়। লালবাবার আশ্রমে এত কষ্ট করে গিয়েও তাঁকে দেখতে না পাওয়ার একটা দুঃখ বা মন খারাপের ব্যাপার ছিলই, সেই আকাঙ্খাও পূরণ হল।

ড্রাইভারের পাশে বসায়, অনেকক্ষণ থেকেই বেশ পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ করে সামনে নেমে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ড্রাইভার জানাল, ইঞ্জিনে তেলবহনকারী পাইপটা ফেটে গেছে। বোঝো ঠ্যালা, এখনি হয়তো বলে বসবে বাস আজ আর যাবে না। ড্রাইভার সাহেব, বাসের ক্লিনার-কাম-কন্ডাক্টার-কাম-হেল্পারকে আগে এটা লক্ষ্য না করায় এবং প্রচুর তেল নষ্ট হওয়ায় খুব একচোট গালিগালাজ করে ওপর থেকে একটা নতুন পাইপ বার করে দিল। অনেক চেষ্টার পর ক্লিনার জানালো, মাপে গোলমাল আছে, ফিট করছে না। ড্রাইভার বাস থেকে নেমে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও লাগাতে না পেরে, মেজাজ হারিয়ে ক্লিনারকে গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। হাজার হোক ঘর-পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘের মতো, এ পথের বাস, জীপে একটু গোলমাল দেখলে, ভয় তো হবেই। যাহোক, আরও বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর, পাইপটা লাগানো হলে, বাসের ইঞ্জিনে অনেক জল ঢালা হল। এবার সুস্থ হয়ে বাস ছেড়ে দিল।

লালবাবার সঙ্গে মিলিটারিদের দেখলাম, খুব সুন্দর সম্পর্ক। লালবাবাকে খুব সম্মান করে, বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বাইরে আসা প্রসঙ্গে লালবাবা একজন যাত্রীকে বললেন, "মন্দির দেখতে চাও তো বদ্রীনারায়ণ যাও। মন্দির দেখে কী হবে? প্রকৃতির রূপ দেখতে চাও তো গোমুখ যাও, তপোবন যাও। এখন যাওয়া অনেক ঝামেলার তাই, না হলে যোশীমঠ থেকে মানস সরোবর কৈলাস যাও"। সত্যিই তাই। কত আশা নিয়ে বদ্রীনারায়ণ গিয়েছিলাম, ওই কী মন্দির? মন্দির আর হোটেল গায়ে গায়ে বিরাজ করছে। কেদারনাথ সেই তুলনায় সত্যিই সুন্দর, পাগল করা সৌন্দর্য। লালবাবা বললেন, হরশিলকে আগে হরপ্রয়াগ বলা হত। আরও কত কথা যে তিনি বললেন। কথায় কথায় একসময় আমরা ডাবরানী এসে গেলাম। ব্যস মুক্তি! এবার আর অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। আমাদের পা দুটোই সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে।।

ছবিতে ডানদিক থেকে - দিলীপ, লালবাবা, লালবাবার গুরুভাই ও লেখক

লালবাবার একটা ছবি তুলব বলে দিলীপের কাছ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিলাম। উনি বাস থেকে নেমে আমাদের চেনা বুদ্ধি সিং-এর দোকানে ঢুকলেন। সঙ্গে একজন লোক। পরে শুনলাম দ্বিতীয়জন লালবাবারই গুরুভাই, ডাবরানীতেই থাকেন। দেখা হয়ে গেল বুদ্ধি সিং-এর সঙ্গেও। বুদ্ধি সিং অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করে সমস্ত খবরাখবর নিলেন। ভালভাবে সমস্ত ঘুরে ফিরছি শুনে খুশি হলেন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গাংগানী-গরমকুণ্ডের সেই সন্দেহজনক ব্যক্তিটির সঙ্গে। একগাল হেসে এগিয়ে এসে সব খবর জানতে চাইলেন। ভীষণ খারাপ লাগছিল। তাকে অহেতুক ওই রকম সন্দেহ করার জন্য নিজেদের সত্যিই খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমাদেরও দোষ দেওয়া যায় না, আমরা যে সভ্য শহরের লোক, ঠগ দেখে দেখে, ভাল লোকও যে দেশে থাকতে পারে, বিশ্বাস করতেই ভুলে গেছি! যাহোক, এবার একটা দোকানে চা আর বনরুটি খেয়ে হাঁটার জন্য তৈরি হলাম। দেখি লালবাবা তাঁর গুরুভাইয়ের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। তাঁর ছবি তুলতে দেন কিনা জানিনা, সরাসরিই বললাম, যদি অনুমতি করেন তো আপনার একটা ছবি তুলতাম। উনি বললেন,"আমার ছবি? আমার ছবি নিয়ে কী করবি?" বললাম, "বাঁধিয়ে রাখব।" রাজি হলেন, গুরুভাই, মাধব ও দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর একটা ছবি নিলাম। মাধব তার জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে আর একটা ছবি তুলল। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এগিয়ে চললাম সেই প্রাণান্তকর কষ্টের আট কিলোমিটার রাস্তার উদ্দেশ্যে।

এবার আর ভুল করা নেই। একটু এগিয়েই প্রথম ঝরনার জল পেট ভরে খেয়ে নিলাম। পথে আর জল পাওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে বেশ একটা খুশির মেজাজে হেঁটে চলেছি। উল্টো দিক থেকে অনবরত মিলিটারি ঘোড়া ও খচ্চর, মাল বয়ে নিয়ে আসছে। একটা খচ্চরকে রক্তাক্ত অবস্থায়, খুব ধীরে ধীরে আসতে দেখলাম। শুনলাম খাদে পড়ে গিয়েছিল। এবার এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাব জানি বলেই বোধহয় হাঁটতে সেরকম কষ্ট অনুভব করছি না। পথটা আবার অদ্ভুত, কোথাও সমতল রাস্তা নেই। হয় একবারে জিভ বার করে ওপরে ওঠো, না হয় একবারে সোজা নিচের দিকে নামো। আমরা এখন ওপর দিকে উঠছি। প্রথমে মাধব, তার পিছনে আমি, সব শেষে দিলীপ। ওপর থেকে বেশ কয়েকটা খচ্চর, পিঠে অনেক মালপত্র নিয়ে, লাইন দিয়ে নেমে, আমাদের দিকে আসছে। মাধব রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। রাস্তার ডানপাশে গভীর খাদ। অনেক নীচ দিয়ে রূপোলি ফিতের মতো গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। বাঁপাশে খাড়া পাহাড় ও রাস্তার মাঝখানে একটু নীচুতে, খানিকটা কাঁচা জায়গা, হয়তো বৃষ্টি বা বর্ষার জল বয়ে যাওয়ার জন্য নালার মতো রাখা। মাধব একপাশে সরে গিয়ে, আমাকেও সরে দাঁড়াতে বলল। দেখলাম খাদের দিকে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। নীচের ওই সরু নালার মতো কাঁচা জমিটায় না নেমে, শরীরটাকে একটু কাত করে, খচ্চরগুলোকে যাবার জায়গা ছেড়ে দিলাম। খচ্চরগুলো পরপর মাধব ও আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। হঠাৎ কী রকম একটা আওয়াজ হতে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দিলীপ একটা খচ্চরের মালপত্রের ধাক্কায়, বাঁপাশের সেই নীচু সমতল কাঁচা জমিতে নেমে গেছে। খচ্চরগুলোর পিছন পিছন একটা লোক, ওগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঠিকমতো নিয়ে যাচ্ছে। দিলীপ খুব কড়া দৃষ্টিতে ভ্রু কুঁচকে, ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, রাস্তায় উঠে এসে, আমাদের পিছন পিছন আবার ওপর দিকে হেঁটে চলল। বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পরে মাধব হঠাৎ আবিষ্কার করল দিলীপের ওয়াটার বটলের ঢাকনা-কাম গ্লাসটা বটলের সঙ্গে নেই। বটলটার মুখে একটা পাতলা চাকতি চেপে বসানো থাকে। তার ওপরে গ্লাশটা প্যাঁচ দিয়ে লাগাতে হয়। কাজেই গ্লাস বিহীন ওই ওয়াটার বটলের কোন মূল্যই নেই। আমি বললাম খচ্চরের ধাক্কায় নিশ্চই ঢাকনাটা ওখানে পড়ে গেছে। দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে আবার নীচের দিকে অকুস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। আমরা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দিলীপ ফিরে এল বটে, কিন্তু ওটাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এখনও পর্যন্ত আমার বর্ষাতির টুপি, মাধবের লাঠির নাল আর দিলীপের ওয়াটার বটলের গ্লাস, তাদের নিজ নিজ প্রভুদের ত্যাগ করে, হিমালয়ে চলে গেছে। আর কে-কে, কাকে কাকে ছেড়ে চলে যাবে জানিনা। দিলীপকে বললাম মন খারাপ না করে সামনের দিকে এগোতে। উত্তরকাশীর আগে কিছু করার উপায় নেই। উত্তরকাশী গিয়ে বটলের মুখটা পলিথিন সিট ও কাগজ দিয়ে ভাল ভাবে শক্ত করে বেঁধে দেব। এবার বেশ জোরে হাঁটা দিলাম। আজ কিন্তু সত্যিই সেরকম উল্লেখযোগ্য পরিশ্রম বোধ হচ্ছে না।

একসময় মাধব দেখাল কিছুটা পিছনে, নিচের দিকে লালবাবা হেঁটে আসছেন। ওনার হাঁটার গতি এত দ্রুত যে এর মধ্যেই আমাদের ধরে ফেলেছেন। এখন বুঝতে পারছি, সেদিন সন্ধ্যার সময় লালবাবার আশ্রম থেকে সত্যনারায়ণ পান্ডার দাহকাজের শেষে, ওরা আমাদের কেন ওদের সঙ্গে গঙ্গোত্রী নিয়ে যেতে রাজি হয় নি। আমি বেশ দ্রুত হেঁটে চলেছি। রাস্তা অনবরত বাঁক নিচ্ছে, ফলে একটু পরেই দিলীপ ও মাধব, আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। কতটা পথ এইভাবে এগিয়েছি জানিনা, সামনে জনা ছয়-সাত যুবক-যুবতীকে আসতে দেখলাম। সবাই বাঙালি। প্রথম এই রাস্তায় বাঙালি কোন মহিলা যাত্রীকে, যাত্রী না বলে তীর্থযাত্রীকে বলা বোধহয় ঠিক হবে, আসতে দেখলাম। ওরা নিজেরাই আলাপ শুরু করে দিল। হাওড়া-কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে। যমুনোত্রী হয়ে গঙ্গোত্রী যাচ্ছে, ক্ষমতায় কুলোলে গোমুখ যাবে। তবে ওদের কথাবার্তায়, গোমুখ যাবার মতো ক্ষমতা থাকলেও, মনোবল আছে

বলে মনে হল না। প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যই জানালাম। ওরা জিজ্ঞাসা করলো, ডাবরানী থেকে আজ বাস পাওয়া যাবে কিনা। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে জানালাম, ভাগ্য ভাল থাকলে, প্যাসেঞ্জার পাওয়া গেলে, ড্রাইভারের মর্জি হলে, আজই বাস পাওয়া যেতে পারে। প্যাসেঞ্জার না পেলে দশ দিনও অপেক্ষা করতে হতে পারে। ইতিমধ্যে মাধব ও দিলীপ এসে গেছে। আমরা এবার ওদের যমুনোত্রীর পথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীরামপুরের এক যুবক জানাল, যমুনোত্রীর পথ খুব কষ্টকর। সেই তুলনায় এ পথে কষ্ট অনেক কম। আরও বলল, ও পথে দেখার বিশেষ কিছু নেই, শুধু মাত্র যাওয়ার জন্যই যাওয়া। চেষ্টা করে দেখুন, পৌঁছে যেতে পারেন। ওর বাচনভঙ্গি সহ্য হল না। বললাম, আমরা হেমকুন্ড সাহেব, ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, বসুধারা, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী আর গোমুখ হয়ে যমুনোত্রীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছি। এতগুলো জায়গার পথের কষ্ট নিশ্চই যমুনোত্রীর পথের কষ্টের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। ওরা এই মরণফাঁদ থেকে কম কষ্টে, সহজে ফিরে আসুক কামনা করে, শুভেচ্ছা জানিয়ে, আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

একে গোটা রাস্তাটাতেই খুব চড়াই উতরাই ভাঙতে হয়, তার ওপর আমরা আবার বাইপাস ব্যবহার করতে শুরু করলাম। ফলে প্রাণান্তকর কষ্ট হলেও খুব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। তবু যেন যাওয়ার সময়ের কষ্টের কাছে কিছুই কষ্ট নয় বলে মনে হচ্ছিল। সব জায়গায় দেখেছি, যাওয়ার সময় একটা নতুন জায়গা দেখার আগ্রহেই বোধহয়, হাঁটার কষ্ট ফেরার সময়ের তুলনায় অনেক কম বলে মনে হয়। একমাত্র এই পথে, ফাঁদ থেকে বেরোবার তাগিদেই বোধহয়, ঠিক তার উল্টো অনুভুতি হচ্ছে। আসবার সময় কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট ব্রিজ পার হতে হয়েছিল। ব্রিজটার তলায় অল্প নিচু দিয়ে কোন একটা ঝরনা বা ছোট পাহাড়ি নদীর জল, নীচে গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। মাধব অনেক ওপর থেকে চিৎকার করে আমায় ডেকে খাবার জল সংগ্রহ করতে বলল। আর কিছুটা এগোলেই যাবার সময় দেখা প্রথম ঝরনাটা পাওয়া যাবে। তবু ওর কথায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েকজন স্থানীয় ছেলে মগ হাতে ব্রিজের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও বোধহয় এই ব্রিজের নীচ থেকেই জল তুলে এনে পান করেছে। পাত্রটা চেয়ে নিয়ে খুব ঢালু পথ বেয়ে নেমে, খানিকটা জল এনে আমরা তিনজনই অল্প করে জল পান করলাম। পাত্রটা ফেরৎ দিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গাংগানীর সেই জলপাই রঙের নতুন ব্রিজটা চোখে পড়লো। গতি বৃদ্ধি করে এগিয়ে গিয়ে, গাংগানীর একটু আগে একটা চায়ের দোকানে, একজনের ডাকে, ঢুকলাম। আসবার সময় গাংগানী বা গরমকুণ্ড থেকে একটু ওপরে উঠে অনেকগুলো সম্ভবত মিলিটারি তাঁবু দেখেছিলাম। এই দোকানটা তখন বন্ধ ছিল। এখন শুনলাম, ওই তাঁবুগুলোতে রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে এবং খাটিয়া ভাড়া পাওয়া যায়। যে ভদ্রলোক আমাদের ডাকলেন, তিনি বললেন, "আপনারা তো যাবার সময় গরমকুণ্ডে ছিলেন। ওই দোকানে আমি আপনাদের দেখেছিলাম।" আমরা ভালভাবে ঘুরেছি শুনে উনি খুব খুশি হলেন। এমন সময় পাশ দিয়ে লালবাবাকে যেতে দেখলাম। দোকানী লালবাবাকে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি গরমকুণ্ডে স্নান সেরে চা খাবেন জানালেন। চা খেয়ে, ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এগিয়ে গেলাম। যাবার পথে লালাজীর দোকানে একবার উঁকি দিয়ে গেলাম। লালাজীর দেখা মিলল না। ব্রিজ পার হয়ে, সোজা ভুখির উদ্দেশ্যে এগোলাম।

এবারের রাস্তা ভাঙা হলেও বাস রাস্তা। সঙ্গীদের বললাম পা চালাতে। সম্ভব হলে আজই ভুখি থেকে সোজা উত্তরকাশী চলে যাব। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। একসময় ভাঙা এবড়ো-খেবড়ো জায়গাটা পার হয়ে, যেখানে ড্রিল করে ব্লাষ্টিং করিয়ে, পাহাড় কেটে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গায় এসে হাজির হলাম। দূর থেকে দেখলাম কয়েকজন লোক, ওই ব্লাষ্টিং করা জায়গাটার আগের বাঁকটায় বসে আছে। একটা বুলডোজার দাঁড়িয়ে আছে। ওটা ব্লাষ্টিং করে ভাঙা পাহাড়ের টুকরোগুলো ঠেলে খাদে ফেলছে। মাধবের পায়ের ব্যথাটা বোধহয় আবার বেড়েছে। চিৎকার করে ওকে তাড়াতাড়ি আসতে বললাম। বুলডোজারটা লোক চলাচলের জন্য কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে। ওটা কাজ শুরু করলে আবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রায় পার হয়ে গিয়ে, মাধবকে হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলছি, ওদিকে বুলডোজারটা আর অপেক্ষা না করে নড়ে উঠে কাজ শুরু করে দিল। একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক কাজ তদারকি করছেন। ভদ্রলোক আমাকে ডেকে এদিকে ফিরে আসতে বললেন। ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে মাধব এসে গেছে। পাঞ্জাবি ভদ্রলোক বললেন "একটু অপেক্ষা করে যান। এখন পার হওয়া বিপজ্জনক"। বুলডোজারটা পাথরগুলো খাদে ঠেলে না ফেলে, রাস্তার ধারে, খাদের দিকে জড়ো করে রাখছে। সম্ভবত একবারে ঠেলে সব পাথর তলার খাদে ফেলবে। ওই জড়ো করা পাথরের ওপর দিয়েই আমাদের পার হতে হবে। অর্থাৎ একবারে রাস্তার ধারে, শেষ প্রান্ত দিয়ে যেতে হবে। ভয় হচ্ছে কোন পাথরে পা দিয়ে সব সমেত খাদে না চলে যাই, সমস্ত পাথরই ভাঙা, নড়বড়ে। অনেক নীচ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। তলায় গড়িয়ে পড়লে গঙ্গার জল মুখে ঢোকার আগেই, গঙ্গাপ্রাপ্তি হবে। একটু পরে একে একে খুব সাবধানে ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে এলাম। এবার রাস্তা পাকা ও বেশ ভাল। বাস যাবার উপযুক্ত। আর হাঁটায় কোনও অসুবিধা নেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুখি চলে এলাম।

হায় কপাল! একটা বাসকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম না। টিকিট কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আজ কোন বাস যাবে না। কাল ভোরে বাস ছাড়বে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আজ বাস না পাওয়া মানে পুরো একটা দিন নষ্ট। তাও আবার ভুখির মতো একটা অখ্যাত গন্ডগ্রামে। আজ উত্তরকাশী যেতে পারলে, আগামী কালই আমরা যমুনোত্রী যাবার হাঁটাপথের শুরু, সায়নাচট্টি চলে যেতে পারতাম। এখন তো মনে হচ্ছে এর থেকে গরমকুণ্ডে লালাজীর দোকানে থেকে গেলেই ভাল করতাম। কোন উপায় নেই। বাঁপাশের ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিলাম। দোকানীর সঙ্গে কথা বলে এখানেই রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেললাম। এখানেও কোনরকম আমিষ খাবার পাওয়া যাবে না। তার মানে সেই রুটি আর পচা আলুর তরকারি কপালে নাচছে। একটু কিছু ভাল খাবারের জন্য জিভ একবারে ছটফট করছে। থাকা খাওয়ার কথা পাকা করার ব্যাপারে কথা বলছি, এমন সময় একটা বাস উত্তরকাশীর দিক থেকে এসে হাজির হল। আবার টিকিট কাউন্টারে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাস আজ যাবে, তবে উত্তরকাশী পর্যন্ত যাবে না। আজ 'ভাটোয়ারী' পর্যন্ত যাবে। ওখানে বাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, সম্ভব হলে উত্তরকাশী যাবে। থাকা-খাওয়ার প্রোগ্রাম চটজলদি বাতিল করে ভাটোয়ারী পর্যন্ত তিনটে টিকিট কাটা হল। কাউন্টার থেকে উত্তরকাশী পর্যন্ত কোনও টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। ভাটোয়ারী পর্যন্ত তিনজনের সেই মোট তিন টাকা ভাড়া লাগল। বাসে অনেক প্যাসেঞ্জার উঠেলেও, বাস ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। "না আঁচালে বিশ্বাস নেই" কথাটার প্রকৃত অর্থ বাস্তবে বুঝতে হলে এইসব এলাকার বাসে চাপতে হবে! বাস ছাড়ার আগে যে কোন মুহূর্তে, আজ আর বাস যাবে না, বা বাস আজ অতদূর না গিয়ে এই জায়গা পর্যন্ত যাবে, শোনার সম্ভাবনা পদে পদে। বাসের সব প্যাসেঞ্জার তাড়াতাড়ি বাস ছাড়ার জন্য অনুরোধ করছে। দেরি হলে উত্তরকাশী যাবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। বেশ কয়েকজন মিলিটারি যাত্রীও আছে। এমন সময় বাসটার ঠিক পিছনে খুব উঁচু একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। ট্রাকটার একেবারে ওপর পর্যন্ত, কাঠের গুঁড়ি বোঝাই। একে একে মিলিটারিরা প্রায় সবাই, ট্রাক ড্রাইভারকে বলে, ট্রাকের ভিতরে ও ওপরে কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপে বসল। জানা গেল ট্রাকটা সোজা উত্তরকাশী যাবে। আমরাও ঠিক করলাম ট্রাক ড্রাইভারকে অনুরোধ করে, এই ট্রাকেই উত্তরকাশী চলে যাব। মাধব বলল, ওতে করে যাওয়া খুব বিপজ্জনক হবে। দিলীপের কিন্তু ট্রাকে যাবার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখলাম। আমিও বুঝতে পারছি, ওই উঁচু ট্রাকে কাঠের ওপর কোন কিছু না ধরে অতটা পথ যাওয়া সত্যিই খুব ঝুঁকির। কিন্তু এই মুহূর্তে উত্তরকাশী যাওয়ার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। ভাবতে ভাবতেই দেখি, অনেক সাধারণ যাত্রীও ট্রাকে উঠে পড়ল। ট্রাকের একেবারে ওপরে, গাছের গুঁড়ির ওপর উঁচু হয়ে বসে, মোটা গুঁড়ি ধরে রয়েছে। ট্রাক একটু লাফালে টাল সামলানো সত্যিই খুব কষ্টকর হবে। ভাবলাম, এগুলো নিয়ে ট্রাকে বসে ভাবা যাবে, আগে ট্রাকে যাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা করে নেওয়া যাক। শেষ পর্যন্ত দিলীপ গিয়ে ড্রাইভারকে অনুরোধ করল বটে, কিন্তু ওর সেই দুর্বল অনুরোধ নাকচ করে দিয়ে, ড্রাইভার জানাল, ভাটোয়ারীতে ট্রাক একটু খালি হবে, তখন সে আমাদের তার ট্রাকে তুলে নেবে। আরও বেশ কিছুক্ষণ বাস ও ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার পর কী হল বুঝলাম না, বেশ কিছু লোক ট্রাক থেকে নেমে এসে আবার বাসে উঠে বসল। একটু পরেই ট্রাকটা ছেড়ে দিল। বাসের ড্রাইভার বলল, ভাটোয়ারীর পরে পাহাড় ব্লাষ্টিং করানো হয়েছে। কাজেই ট্রাকের সব যাত্রীকেই ওখানে নেমে যেতে হবে। আজ আর কোন গাড়িকেই ভাটোয়ারীর ওদিকে যেতে দেওয়া হবে না। সামান্যই পথ, একটু পরেই আমরা ভাটোয়ারী পৌঁছে গেলাম। বাস কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, আজ আর বাস যাবে না। কাল ভোর বেলা বাস ছাড়বে। বাসের অফিসের সামনে অনেক প্যাসেঞ্জারের ভিড়। সকলেই বাসকে আজই উত্তরকাশী নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। ড্রাইভারের কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারছি, ও ইচ্ছা করেই আজ বাস নিয়ে যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত অত লোকের অনুরোধে, কর্তৃপক্ষ জানাল, ওদিক থেকে কোন বাস এলে, তবেই এই বাস যাবে। ট্রাক থেকে সত্যিই সব লোককে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধব বলল, অনেক লোক, জায়গাটাও খুবই ছোট, আগে থেকে একটা থাকার জায়গা ঠিক করা উচিৎ। কিন্তু ওই যে, আশায় মরে চাষা। আমাদের এখনও আশা, বাস হয়তো যাবে। এর মধ্যে উত্তরকাশীর দিক থেকে সত্যিই একটা বাস এসে উপস্থিত হল। কথামতো এবার আমাদের বাস ছাড়ার কথা। সমস্ত প্যাসেঞ্জার বাসে উঠে পড়ল। এবার কিন্তু ড্রাইভার অন্য চাল চালল। আমাদের বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর, ভুখিগামী বাস ড্রাইভারকে বলল, এই বাসের প্যাসেঞ্জারদের উত্তরকাশী নিয়ে যেতে। সে নিজে তার বাসে ভুখির প্যাসেঞ্জারদের পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ এ বাসের প্যাসেঞ্জারদের ওই বাস এবং ওই বাসের প্যাসেঞ্জারদের এই বাস নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু আপত্তি করল অন্য বাসের ড্রাইভার। সে এই প্রস্তাবে রাজি হল না। আমাদের উত্তরকাশী যাওয়ার বাড়া ভাতে, ওই ড্রাইভার, জল ঢেলে দিল। সকলের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে, আমাদের বাস ড্রাইভার বলল, ওদিকের রাস্তা ভাল নেই, বাস আজ আর যাবে না। কাল খুব ভোরে বাস যাবে। ট্রাকটা চলে গেল। আমাদের

অজানা-অচেনা ছোট্ট একটা আধা শহরে বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে, ড্রাইভার ও কন্ডাক্টর বাস কর্তৃপক্ষের অফিসে আড্ডা দিতে চলে গেল।
অফিস ঘরের ঠিক পাশের ঘরটা আমরা রাতের আস্তানা হিসাবে ভাড়া নিলাম। এখানে থাকার মতো কোন হোটেল নেই। ঘরবাড়ির সংখ্যাও খুব কম। কোন গেষ্ট হাউস বা ট্রাভেলার্স লজও নেই। ঘরের মালিকের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করলাম, আমরা তিনজন থাকব, আর কাউকে ঘরে ঢোকানো যাবে না। ছ'টাকা ভাড়া দিলে সে তাতে রাজি আছে জানাল। আমরাও রাজি হয়ে গেলাম। ঘরের মালিক ভাঁজ করা কাঠের দরজা খুলে দিল। এটা একটা গুদামঘর বলে বলে মনে হল। এর দরজাও, দোকানের দরজার মতোই একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং একদিক থেকে অপর দিক ভাঁজ করে করে খুলতে হয়। ঘরের ভিতরে একপাশে, প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে, সম্ভবত ময়দার বস্তা, একটার ওপর একটা, প্রায় ছাদ পর্যন্ত সাজিয়ে রাখা আছে। পাশে দুটো চওড়া তক্তাপোশ। তক্তাপোশে গরমকুণ্ডের লালাজীর দোকানের মতোই নোংরা, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত তোষক পাতা ও একই মানের লেপ ভাঁজ করে রাখা আছে। ঘরের পিছন দিকে, অর্থাৎ মূল দরজার বিপরীতে আর একটা সরু দরজা বন্ধ করা আছে। ঘরের মালিক পাশ দিয়ে গিয়ে পিছনের ছোট দরজার শিকলটা খুলে দিল। এখানে বেশ গরম। রাতে এই বন্ধ গুদাম ঘরে ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। দরজা খুলতে পিছনে এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ল। দরজা দিয়ে বেরিয়েই, সরু বারান্দা। আমাদের ডানপাশের বাসের অফিস ঘরেরও একই রকম একটা দরজা দিয়ে, ওই বারান্দায় আসা যায়। আমাদের এই বাড়িটা যদিও একতলা, বাস রাস্তার ওপরে একই লেভেল-এ অবস্থিত, তবু পিছনের বারান্দায় দাঁড়ালে বোঝা যায়, অন্তত তিন-চার তলা উচ্চতায় দাঁড়িয়ে আছি। বারান্দার ঠিক পরেই খাদ। বেশ নিচে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। বারান্দাটা যেন ওই খাদের ওপর ঝোলানো। দোকানের মালিককে বিদায় করে, বারান্দায় বসে, প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে, মনের সুখে এখান থেকে কেনা চিনাবাদাম খেলাম। আহা কী সুখ! বাদামের খোলা ফেলার কোন ঝামেলা পর্যন্ত নেই। হাত বাড়িয়ে নীচের খাদে ফেলে দিলেই হল। কত সুবিধা। দোকানের মালিক নিজে থেকে উপযাচক হয়ে এসে, বেগন বা ফ্লিট জাতীয় কিছু একটা, ঘরের তক্তাপোশের ওপর বেশ ভাল করে স্প্রে করে দিয়ে গেল। এতদিন অন্যান্য সব জায়গায় দেখে এসেছি, দোকান, হোটেল বা লজে,পিসু নামক ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে কোন ধর্তব্যের ব্যাপার বলে মনে করে না। এ বাবু আবার কিছু বলার আগেই বিছানায় স্প্রে করে দিয়ে যেতে, এখানে মহাপিসু বা রামপিসু জাতীয় কিছু আছে কিনা ভেবে ভয় হল।
আসার সময়, বাস থেকে নেমেই, একটা ছোট্ট হোটেলগোছের দোকানে ডিম সাজানো আছে দেখেছিলাম। তাই বোধহয় সন্ধ্যাবেলাতেই প্রচন্ড খিদে-খিদে পাচ্ছে। বাইরে যাব বলে ঘরের পিছন দিকের ছোট দরজাটা বন্ধ করে শিকল দিতে গিয়ে দেখি, শিকলটা মাপে বেশ ছোট। মালিক কী কায়দায় ওটা আটকে ছিল বুঝতে না পেরে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, সামনের বিরাট চওড়া দরজাটা হাট করে খুলে রেখে, সমস্ত জিনিসপত্র ঘরের একপাশে রেখে, জলখাবার খেতে গেলাম। সামনের দরজা খুলে রাখার কারণ, যাতে পিছনের দরজা দিয়ে পাশের ঘরের কেউ ঢুকলে রাস্তার লোক দেখতে পায়। রাস্তার দু'পাশে অনেক দোকান। রাস্তার ওপাশে স্টেট ব্যাঙ্ক। সুন্দর রাস্তা পাহাড় ও গঙ্গার পাশ দিয়ে চলে গেছে। আমরা তিনজন বুভুক্ষু সোজা সেই দোকানে গিয়ে তিনটে ওমলেট, সেঁকা পাঁউরুটি আর চায়ের অর্ডার দিলাম। মনটা বেশ খুশিতে ভরে গেছে। ডিমের ওমলেট আমাদের উত্তরকাশী না যেতে পারার দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছে। রাতের কী খাবার পাওয়া যাবে খোঁজ করতে গিয়ে তো দেখি, আমাদের জন্য আরও অনেক বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে। এখানেই থেকে যাব কী না ভাবতে হবে। এই দোকানে মাংস পাওয়া যায়, - দাম পাঁচ টাকা প্লেট! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে, তিন প্লেট মাংসের অর্ডার দিয়ে, জলখাবার খেয়ে, এদিক ওদিক একটু ঘুরতে গেলাম। আকাশে বেশ মেঘ করেছে, বৃষ্টি এলেও আসতে পারে। একটু ঘুরেফিরে, রাতের আস্তানায় ফিরে গেলাম।
রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খেতে গেলাম। এতদিন পেট ভরাবার জন্য খেতে গেছি, আজ অনেক দিন পরে, খাওয়ার জন্য খেতে গেলাম। দোকানে গিয়ে দেখি তিনটে বেঞ্চ, তিনটেতেই খদ্দের ভর্তি। এইসব এলাকার লোকেরা যেমন পরিশ্রমী হয়, এদের আহারও সেইরকম দেখার মতো। একজন লোক সেই পুরোনো কায়দায় রুটি তৈরি করে যাচ্ছে। আর একজন খাবার থালায় রুটি দিয়ে যাচ্ছে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। রুটির যোগান দিতে গিয়ে, দু'জনেই হাঁফিয়ে যাচ্ছে। এক-একজন বোধহয় গোটা কুড়ি করে রুটি খেয়ে নিল। কাঠের আগুনের তেজ ক্রমে কমে আসছে, আমরা দাঁড়িয়েই আছি। অন্য কোথাও যাবারও উপায় নেই, কারণ অন্য কোথাও এমন সুখাদ্য মিলবে কিনা জানা নেই। এবার রুটি খাওয়া শেষ করে, ওরা চাউল আনতে বললো। তা বলুক, যা খুশি আনতে বলুক, মাংস আনতে না বললেই হল! কিন্তু ভয় হল রুটির মতো চাউল খেলে, আমাদের রাত এগারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবে। বোধহয় আমাদের তিনজনের ক্ষুধার্ত, অসহায়, অবাক হওয়া মুখগুলো খেয়াল করে লজ্জায় ওরা আজকের মতো খাওয়ায় ইতি টানল।
তিনজন মহানন্দে বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। তিনটে প্লেটে, চার টুকরো করে মাংস ও ঝোল দেওয়া হল। হাওড়া-কলকাতায় অমানুষ পাঁপড় নামে, এক্রকম পাঁপড় বিক্রি হয়, ভাজলে হলদেটে গোল নলের মতো দেখতে। চার টুকরোর মধ্যে তিন টুকরো করে ওই রকম নলী। লম্বা কোন নলীকে পিস্ পিস্ করে কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, নলীগুলোকে ঘষে মেজে বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে। বাইরে তো কিছু নেই-ই ভিতরেও কোন ময়লা নেই, চোখের কাছে দুরবীনের মতো ধরলে দূরের জিনিস একবারে পরিষ্কার দেখা যায়। বাধ্য হয়ে ফেলে দিলাম। খুব লজ্জা করলেও, বলতে বাধা নেই, ফেলবার আগে চুষে নিতে কিন্তু ভুল করি নি। কাঠের উনুনে আগুন তখন প্রায় নিভে এসেছে। ফলে প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর, তিনজনের তিনটে করে আধ পোড়া, আধ কাঁচা রুটি নিয়ে আসছে। তিনজনের তিন-চারটে করে রুটি পেতেই, বেশ দেরি হয়ে গেল। অগত্যা আর রুটি খাবার আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। মাংসের কথা বলতে দোকানদার বলল, এখানে একমাত্র সেই মাংস রাখে। উত্তরকাশী থেকে মাংস আসে। ফলে যা পাঠায় তাই নিতে হয়। মিলিটারিরা মাঝে মধ্যে পাঁঠা কাটে। তারা সমস্ত ভাল মাংস নিয়ে, তাকে এই জাতীয় মাংসই বিক্রি করে। স্থানীয় লোকেরা বাধ্য হয়ে এই মাংসই কিনে খায়। সে ইচ্ছা করে আমাদের খারাপ মাংস দেয়নি। এরপর তাকে আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। খাওয়া সেরে মৌরি মুখে দিয়ে পরম সুখে গুদামঘরে ফিরে এলাম।
এরকম গুরুপাক খাবার পর একটু নেশা না করলে চলে না। দেখি একটাও সিগারেট সঙ্গে নেই। আমি ও মাধব, দিলীপকে গুদাম ঘরে বসিয়ে রেখে, গেলাম সিগারেটের দোকানের খোঁজে। আশেপাশে কোন দোকান খোলা নেই। অত রাতে, রাত বলতে তখন প্রায় দশটা বাজে, যে কয়টা দোকান খোলা আছে, সব-ই টেলারিং শপ। এখানে এত জামা প্যান্ট কারা তৈরি করতে দেয়, ভগবান জানেন! আশা ছেড়ে দিয়ে গুদাম ঘরে ফিরে এসে দেখি, দিলীপ একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তক্তাপোশে বসে কথা বলছে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে গল্প করলেন। একপুরুষ আগে থেকেই তাঁরা এখানকার বাসিন্দা। সৎপথে ব্যবসা করায় আজ আর তাঁর কোন অভাব নেই। গত বছরের বন্যার কথা উঠতে বললেন, এরকম ভয়ঙ্কর বন্যা তিনি কোনদিন দেখেননি। প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে তিনি যাবার জন্য উঠলেন। আমাদের কাছে সিগারেট নেই শুনে বেশ কয়েকটা বিড়ি দিয়ে গেলেন।
জল খেয়ে, বাইরের বড় দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। দিলীপ বলল, ভদ্রলোক এসে তার ঘড়িটার খুব প্রশংসা করে, হাতে নিয়ে দেখতে চান এবং কত দাম ইত্যাদি খোঁজখবর করেন। লোকটার ঘড়িটা ছিনতাই করার মতলব আছে ভেবে ও খুব ভয় পেয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রেই পরে আমাদের অনুতাপ হয়। আমরা সবাইকে কলকাতার কলুষিত মন নিয়ে বিচার করি, সন্দেহ করি। এখানে পিসু আছে কিনা জানার সৌভাগ্য না এখনও হলেও, ছারপোকার দৌরাত্ম্য যথেষ্ট আছে। তাদের বিছানার ওপর দিয়ে পরিবার নিয়ে ঘোরাফেরা করতেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ছারপোকারা বোধহয় পিসুর এঁটো খায় না, তাই রাতে ওরা আমাদের খুব একটা অত্যাচার করেনি।
বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। সেপ্টেম্বর মাসের দু তারিখ। আজ সম্ভবত সায়নাচট্টি পৌঁছাব। তার মানে আগামীকাল যমুনোত্রী যাচ্ছি। দিলীপ ও মাধবকে বিছানায় দেখতে পেলাম না। বালিশের তলায় দেখলাম ওদের ঘড়িদুটো রাখা আছে। ওগুলো পকেটে নিয়ে, দরজা খুলে রেখেই রাস্তায় এলাম। সকালের কাজকর্ম সেরে, হাতমুখ ধুয়ে, চা জলখাবার খেয়ে তৈরি হয়ে নিয়ে বাসে গিয়ে নিজেদের আসন দখল করে বসলাম। ঠিক সময়েই বাস ছেড়ে দিল। তিনটে উত্তরকাশীর টিকিট বার টাকা ত্রিশ পয়সা দিয়ে কেটে নিয়েছিলাম। উত্তরকাশী ট্রাভেলার্স লজ থেকে মালপত্রগুলো নিতে হবে। বাস আবার সেই আগের দেখা রাস্তা দিয়ে উত্তরকাশীর পথে এগিয়ে চলল। একসময় আসবার পথে দেখা ড্যামটাকে বাঁপাশে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। আসবার পথে এ রাস্তা আমরা দেখে গেছি, কাজেই নতুন করে দেখার কিছু নেই। তাছাড়া ভয়ঙ্কর খাদ, সুন্দরী ঝরনা, মন মাতানো রঙিন ফুল, কোন কিছুই আর আমাদের আগের মতো পাগল করছে না। মনে শুধু একটাই চিন্তা, কখন উত্তরকাশী পৌঁছব, আজ সায়নাচট্টি পৌঁছতে পারব তো?
ভাবতে ভাবতেই উত্তরকাশীতে বাস এসে দাঁড়াল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আগের পর্ব - কঠিন পথে গোমুখে

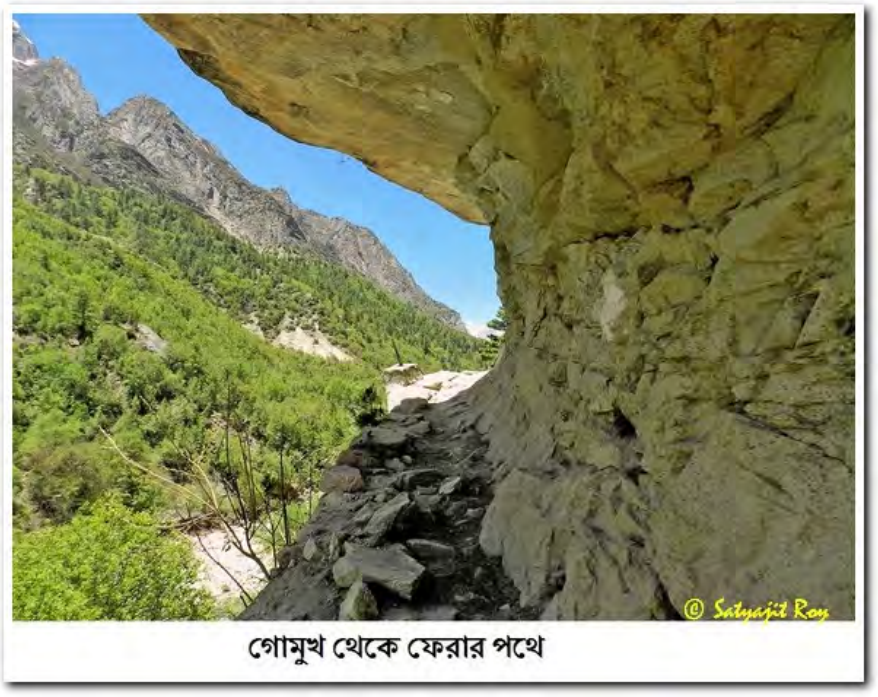

গোমুখ থেকে ফেরার পথে

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অতি সাধারণ এক ভ্রমণ কাহিনি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যেবেলাতেই বন্ধুর ফোন পেলাম। জানালেন, আগামীকাল একটু তাড়াতাড়ি উঠবেন, জানি কষ্ট হবে, কিন্তু কিছু করার নেই। সূর্য ওঠার কিছুটা পরই বের হতে পারলে রাস্তায় গরমে কষ্ট কম হবে। আর গন্তব্যে পৌঁছে মন্দির দেখতেও সুবিধা হবে।
উত্তরে জানালাম, যথা আজ্ঞা। ঠিক সময় তৈরি থাকব। চিন্তা করবেন না।
হাতের কাছে যে কটি বই ছিল সেগুলি হাতড়ে দেখছিলাম কয়েক দিন ধরেই। বীরভূমে নানুরের কাছে একটি প্রাচীন গ্রাম উচকরণ। উচকরণে রয়েছে পোড়ামাটির চারটে শিব মন্দির (প্রতিষ্ঠাকাল বঙ্গাব্দ ১১৭৫)। মাঘী পূর্ণিমায় গ্রামে চাঁদ রায়ের উৎসব হয়। চাঁদ রায়ের আট চালায় (খ্রিষ্টাব্দ ১৭৬৮) কাঠের উপর দেবদেবীর সুন্দর মুর্তি খোদাই করা রয়েছে। আঁকা রয়েছে জটায়ু-লাউসেনের কাহিনি। শুধু তাই নয় এখানে বাংলা ১১৫৬ সালের ২ আশ্বিন হৃদয়রাম সৌ 'ধর্মমঙ্গল' রচনা শেষ করেন। মনে পড়ছিল স্কুলে পড়ার সময় ধর্মমঙ্গল কাব্য বা লাউসেনের কাহিনি পড়েছিলাম। উচকরণ গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছেটা তাই চাগিয়ে উঠেছিল। বন্ধুকে জানাতেই উনিও এক কথাতেই রাজি হয়েছিলেন। শুধু সঙ্গী নয়, সারথিও বটে অর্থাৎ মোটর সাইকেল চালাবেন উনি আর আমি পিছনে বসে থাকব।
যাত্রার শুরুতেই গৃহিণী আমাদের সাবধান করেছিলেন, 'মনে রেখ বুড়ো হয়েছ। এরকম হুট করে বেরোনো এবার বন্ধ কর। হাত পা ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না...' ইত্যাদি ইত্যাদি।
বর্ধমান-কাটোয়া রোডে নর্জা মোড় থেকে নতুনহাটের রাস্তা ধরলেন সারথি। পার হলাম অজয়। তারপর বাদশাহী রোড না ধরে বাঁ দিকে খুজুটিপাড়া হয়ে যে রাস্তা নানুর গিয়েছে সেই পথ ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা। অজয়ের ব্রিজের ওপর উঠে বাঁ দিকে দূরে একটি বাড়ি দেখালেন দেখিয়ে তিনি বললেন, বিখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাড়ি এটা। আমার মনে পড়ল কবির লেখা দুটি লাইন -
"বাড়ি আমার ভাঙ্গন ধরা অজয় নদীর বাঁকে
জল সেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।"
দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম সত্যিই কবির বাড়ির কাছে নদী কেমন বাঁক নিয়েছে।
পথ চলতি মানুষদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম নানুরের রাস্তায় বালিগুনি গ্রাম থেকে বাঁ দিকে যেতে হবে উচকরণ যাবার জন্য। একসময় বালিগুনি পৌঁছলাম। তারপর সেখান থেকে উচকরণ। একটি চালা ঘরের বারান্দায় কয়েকজন বয়স্ক মানুষ বসেছিলেন,বাইক থেকে নেমে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম শিব মন্দিরের অবস্থান কোথায়। মন্দির যাওয়ার রাস্তার হদিস দেওয়ার পর জানতে চাইলেন, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আসার উদ্দেশ্যটাই বা কী এমন নানা কথা।
বাংলার গ্রামগঞ্জে অজস্র পুরনো মন্দির অযত্নে অবহেলায় পড়ে রয়েছে, ভেঙে পড়ছে, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে প্রত্নসম্পদ। অথচ আমাদের কারো হুঁশ নেই। এই সব মন্দির দেখতে গেলেই অনেক গ্রামবাসী ধারণা করেন আমরা কোন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে এসেছি। মন্দিরগুলি কোন না কোন পরিবারের সম্পত্তি অথচ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁদের চরম অনীহা প্রকাশ পায়। সে কথা তাঁদের জানালে শুনতে হয়, সরকার কোনও সাহায্য করে না। উচকরণেও একই কথা শুনতে হল। আমি বিনীত ভাবে জানালাম,বাড়ি বা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যদি সম্পত্তি মালিকের হয়, তবে মন্দির রক্ষাও তাঁদের একই ভাবে করা উচিৎ। তাহলে সরকারের প্রশ্ন আসছে কেন? সম্পত্তির মালিক তাঁর দায়িত্ব পালন করলেই সমস্যা মিটে যায়।

ছবি নং - ১

ছবি নং - ২

সরখেল পরিবারের বাড়ির সামনে এক টুকরো জমি, সেখানেই রয়েছে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত চারটি শিব মন্দির [ছবি নং ১]। মন্দিরগুলি বড় নয়। পোড়ামাটির অলংকরণ দেখতে শুরু করেছি এমন সময় পূজারী ব্রাহ্মণ এলেন নিত্যপূজা করতে। উনি একটি মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পূজা শুরু করলেন,আমরাও আমাদের মতো দেখতে লাগলাম।
পোড়ামাটির মন্দিরে অলংকরণগুলি সাধারণত সজ্জিত থাকে প্রবেশদ্বারের খিলানের ওপরে,দ্বারের দুই পাশে ওপর থেকে নীচে সারিবদ্ধভাবে এবং

খিলান শীর্ষের খানিকটা ওপরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে সাজানো। উচকরণের মন্দিরগুলির অনেক পোড়ামাটির ফলকই আজ অদৃশ্য,সেগুলি টালি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। একেবারে ডানপাশের মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের খিলান শীর্ষে রয়েছে রামায়ণ কাহিনির সুন্দর একটি প্যানেল। দেখানো হয়েছে রাম-লক্ষণ সহ বানর বাহিনীর সঙ্গে কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ। বানরেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কুম্ভকর্ণ বানর ভক্ষণরত। প্যানেলের বাম দিকে রাম-লক্ষ্মণ ধনুকের সাহায্যে বাণ নিক্ষেপ করছেন। তাঁদের পিছনে রয়েছে জোড় হস্তে জাম্বুবান এবং শেষে হনুমান [ছবি নং ২]।

ছবি নং - ৩

ছবি নং - ৪

পাশের মন্দিরটির খিলানশীর্ষের প্যানেলে রয়েছে দশানন রাবণের সঙ্গে রাম-লক্ষণের যুদ্ধ [ছবি নং ৩]। রাম-লক্ষ্মণ এবং রাবণ দুপক্ষই মকরমুখী রথে চেপে যুদ্ধ করছেন। রাম-লক্ষ্মণ তীর ধনুকের সাহায্যে, অপরদিকে দশানন বর্শা এবং তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধরত। প্যানেলটির নীচের অংশে (ডান দিকে) বাদকেরা ঢাক,ডগর এবং সানাই বাজিয়ে যোদ্ধাদের উৎসাহিত করছে। এছাড়া আরও কয়েকটি অসাধারণ ফলক রয়েছে এই মন্দিরে। একটিতে নববিবাহিত দম্পতি পাশা খেলছেন [ছবি নং ৪]। কারো কারো মতে এটি সদ্য বিবাহিত শিব-পার্বতীর কাহিনি। বরের চেহারা দেখে কেউ মনে করছেন এটি গৌরীদানের দৃশ্য,যা এদেশে উনবিংশ শতকে আকছার ঘটত। মন্দির উপরিভাগে সপারিষদ রামসীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট। উপরিভাগের দুই কোণে মকরবাহনে গঙ্গাদেবী (বাম কোণে) এবং গড়গড়া টানছেন এক ব্যক্তি (ডান দিকের কোণে)। তার পাশে প্রভুভক্ত কুকুর বসে রয়েছে [ছবি নং ৫]।

ছবি নং - ৫

ছবি নং - ৬

অপর দুটি মন্দিরের একটির খিলানশীর্ষে রয়েছে দশমহাবিদ্যার কয়েকটি রূপ এবং কালী। অন্যটিতে রয়েছে লঙ্কা যুদ্ধ। এছাড়া রয়েছে মনোহরণকারী বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক, যেমন গরুড় বাহনে শ্রী বিষ্ণু,চতুর্মুখ ব্রহ্মা,নারদ,চতুর্ভুজ গৌরাঙ্গ এবং কৃষ্ণ কাহিনির বেশ কয়েকটি ফলক। মন্দিরগুলি দেখার পর আমরা সেই আটচালার সন্ধান করতে লাগলাম যেখানে মাঘী পূর্ণিমায় চাঁদ রায়ের উৎসব হয়। সেখানে পৌঁছে বেশ হতাশ হতে হল। বইয়ে পড়েছিলাম এখানে কাঠের উপর জটায়ু লাউসেনের কাহিনি খোদাই করা রয়েছে। যে পরিবারের সম্পত্তি এই মন্দিরটি তাঁরা জানালেন,সংস্কারের ফলে (সরকারি দফতরকৃত?) অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। তবে মন্দিরের গর্ভগৃহ প্রবেশদ্বারে অনেক মুর্তি খোদাই করা আছে যেমন মারীচবধ,রামসীতা,দশানন রাবণ,দশাবতার,কংশবধ,কৃষ্ণ কাহিনি ইত্যাদি [ছবি নং ৬]।

উচকরণ বিভিন্ন কৃতী মানুষের জন্মস্থান। রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিভক্ত বাংলার পোস্টমাস্টার ছিলেন রজনীকান্ত ভট্টাচার্য। বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যাপনা করতেন বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মশাই। বীরেনবাবু আমার পরিচিত। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকার সুবাদেই এই পরিচয়। বেশ কিছুকাল আগেই অবসর গ্রহণ করেছেন। আমার ধারণা ছিল বর্তমানে উনি এই গ্রামেই বাস করছেন। ইচ্ছা ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করার। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম উনি বর্ধমানেই থাকেন।

ছবি নং - ৭

ছবি নং - ৮

উচকরণ থেকে বের হয়ে নানুর অভিমুখে রওনা হলাম। সারথি আমাকে হাজির করলেন দ্বিজ চণ্ডীদাসের জন্মস্থানে। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি মন্দির - চণ্ডীদাস সেবিত বিশালাক্ষী ও কয়েকটি শিব মন্দির [ছবি নং ৭]। মন্দিরগুলো দেখতে অনেকটা সময় লাগল। দুর্গা মন্দিরে আলাপ হল সেবাইত পরেশনাথ চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গে। এই মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা হয়। পরেশবাবু দেবী মূর্তি তৈরি করছেন দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম সেদিন। জানালেন গত ৫০ বছর ধরে মূর্তি তৈরি করছেন। সাধারণত মৃত্তিকা কর্মীরাই দেবস্থানে এসে অথবা নিজের বাড়িতে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন। এখানে সেবাইত নিজে দেবী মূর্তি তৈরি করছেন ভালবেসে। এমন ঘটনা সত্যি বিরল [ছবি নং ৮]।
সূর্যদেব মাথার ওপরে বিরাজ করছেন,রোদের তেজও বেশ বেড়েছে তাই একটি গাছের নীচে ধপ করে বসে পড়লাম। জিরিয়ে নিলাম খানিকটা। সেই সঙ্গে ভাবনা চিন্তা এরপর কোথায় যাব। ঠিক হল রাস্তায় কিছু খেয়ে নিয়ে বোলপুরের কাছে সুপুরই হবে আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল। ওখানে রয়েছেন আমাদের পরিচিত কয়েকজন। তৈরি করেছেন একটি এন.জি.ও.। সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছেন নিরন্তর।

সুপুরেই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহার আদি বাড়ি। বিশাল বাড়িটি আজ আর ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (২৪শে মার্চ ১৮৬৩ - ৪ঠা মার্চ ১৯২৮) বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ডে আইন পড়তে যান। ফিরে এসে ওকালতি শুরু করেন,ব্যারিস্টার হন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯০৮ সালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে বাংলার প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করেন। কয়েক বছর পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন (১৯১৫-১৬)। ১৯২০ সালে বিহার এবং ওড়িশার গভর্নর হিসাবে নিয়োজিত হন উনি। গত শতকের প্রথম ভাগে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বাংলা দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের একজন হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।
যে এন.জি.ও-র অফিসে আমরা সেদিন দুপুরে হাজির হয়েছিলাম, সেটি লর্ড সিনহার বাড়ি সংলগ্ন ওই পরিবারের অপর একটি বাড়িতেই অবস্থিত। এখানে গ্রামের মহিলাদের সেলাই শেখানো হয়,অল্পবয়সী আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষাও দেওয়া হয়।
লর্ড সিনহাদের বাড়িটির ছাদ ভেঙে পড়েছে। দরজা জানালা কড়ি বরগা সব চুরি হয়ে গেছে। বড় বাড়িটার দিকে তাকাতেও খারাপ লাগে। একশো বছর আগে এই বাড়িটাই লোকজনে জমজমাট হয়ে থাকত। সকলের দৃষ্টি এদিকেই পড়ত। আর আজ এটি খন্ডহর।

ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। এবার সঙ্গী হলেন ওই সংস্থার দুজনও। আমাদের গন্তব্য সবুজবন সংলগ্ন ইটন্ডা গ্রাম। গ্রামটি অজয় নদের ধারেই অবস্থিত। উদ্দেশ্য বীরভূমের অন্যতম সুদৃশ্য টেরাকোটা অলংকৃত পোড়ামাটির জোড়বাংলা মন্দির দেখা। ইটন্ডা গ্রামটি অতি প্রাচীন, এক সময় এখানে নৌবন্দর ছিল। এই সুন্দর জনপদটি ১৭৪৫ সালে মারাঠা বর্গি আক্রমণে ধ্বংস হয়। নষ্ট হয়ে যায় অনেক কিছুই।
জোড়বাংলা কালী মন্দিরটি দেখতে শুরু করেছি সবে,এমন সময় আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। সারথি আমাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'গঙ্গাফড়িং উড়ছে,নিশ্চিত ঝড়বৃষ্টি হবে। আমাদের এখনই রওনা হতে হবে।' যেতে হবে অনেকটা পথ। সুদৃশ্য মন্দিরটা ছেড়ে চলে আসতে হল দেখা হল না,মনটা তাই খারাপ হয়ে গেল। সামান্য কয়েক কিলোমিটার পথ আসতেই শুরু হল প্রবল ঝড় বৃষ্টি। গাছের ডালপালা ভেঙে পড়তে লাগল রাস্তায়। বৃষ্টির ধারা বাড়তেই রাস্তার ধারে একটি মাটির বাড়ি দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। মোটর সাইকেল রাস্তার পাশে স্ট্যান্ড করতে করতেই প্রায় ভিজে গেলাম দুজনে। মাটির চালা ঘরটির সামনে একফালি বারান্দা। বাড়ির মালকিন তার দুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে হাসি মুখে আমাদের আশ্রয় দিল। বারান্দায় একটি খাটিয়া পাতা রয়েছে। আমাদের আগেই অল্পবয়সী এক দম্পতি এখানে আশ্রয় নিয়েছে।
বাড়িতে দুটি ঘর। একটি ঘরে বড় ছেলেটি খেলা করছে। অন্য ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে রয়েছে মালকিন,কোলে শিশু পুত্র। শিশু পুত্রটিকে সামলাতে সামলাতে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল মেয়েটি। ওর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম অনেক কিছুই। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে

চারদিক। জলের ছাট এসে আমাদেরও ভিজিয়ে দিচ্ছে। স্বার্থপরের মতো বারান্দার ভিতরের দিকে চলে এসেছি আমি। এতো অসুবিধা সত্ত্বেও মেয়েটি নিজের কাজ করে চলেছে। জানাল,অজয়ের বান এলে এই অঞ্চল ডুবে যায়। সেক্ষেত্রে এদের আশ্রয় নিতে হয় কাছাকাছি কোন উঁচু অঞ্চলে বা রাস্তায়।

মেয়েটির স্বামী বাইরে রয়েছে,এই দুর্যোগে সে কখন বাড়ি ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই। এই অবস্থায় আমরা অস্থির হয়ে পড়তাম। সেলফোন কান থেকে নামত না। অথচ এই মেয়েটির ব্যবহারে কোন অস্থিরতা দেখলাম না। ভাবি,শহরকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের কত তফাৎ! শহরকেন্দ্রিকতা আমাদের কত না পাল্টে দিয়েছে! এখন আমরা অল্পে বিচলিত হয়ে পড়ি।

ঘণ্টা খানেক প্রবল বৃষ্টির পর বৃষ্টির ধারা একটু কমতেই সারথি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভিজতে পারবেন তো? তা হলে এখনই রওনা হব।'

ক্যামেরাটি পলিথিন প্যাকেটে মুড়ে ব্যাগের ভেতর রেখে আমাদের যাত্রা শুরু হল আবার। সারা রাস্তায় কম বেশি বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেগ পেতে হয়েছিল সেদিন। সারথির আঙুল অবশ হয়ে আসছিল ঠাণ্ডা হাওয়ায়। অসুবিধা হচ্ছিল মোটর সাইকেল চালাতে। আমি মোটর সাইকেল কেন সাইকেলই চালাতে পারি না, অকম্মা। সুতরাং সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না। তালিত রেল গেট পার হওয়ার সময় ভেজা রেল লাইনে মোটর সাইকেলের চাকা পিছলে যেতেই আমরা পড়তে পড়তে বেঁচেছিলাম। দুজনের পায়েই অল্প বিস্তর আঘাত লেগেছিল।

বাড়ি পৌঁছে শেষ হয়েছিল সেদিনের ভ্রমণ। তবে আজও ভুলতে পারিনি আশ্রয়দাত্রীর সহজ সরল ব্যবহার। প্রবল বৃষ্টির সময়ে আমাদের মত অচেনা মানুষদের সাহস যুগিয়ে বলেছিল, 'থেকে যাও না আজ রাতটা। অতটা পথ আজ আর যাবার দরকার নেই।' এই কথাটা আজও আমি শুনতে পাই,ভুলতে পারিনি সেই গলার স্বর। ভাবি,আমাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা অচেনা অজানা মানুষ দেখলেই বাড়ির দরজা বন্ধ করি। আর গ্রামের সরল মানুষ এক নিমেষে পরকে আপন করে নেয়। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! এই জন্যই বারে বারে ছুটে যাই গ্রাম বাংলায়। রাস্তার ধারে বসে মুড়ি খাই। হাঁটুর ওপরে কাপড় পরা মানুষটার সঙ্গে গল্প করি। ভ্রমণের জন্য আমাকে যেতে হয় না ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া তুরস্ক, এমন কী সিমলা বা মানালিও। যতদিন গ্রাম বাংলা আছে, আছে এই মানুষগুলো, আমাকে ভাবতে হবে না এবার কোথায় যাব। কাঁধের ঝোলায় জলের বোতল আর ক্যামেরা থাকলেই হল।

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা।

কেমন লাগল : - select -
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

দাঁতনে -বুদ্ধদন্তের খোঁজে

তপন পাল

(১)

মন যাই যাই। পর পর পাঁচদিন ছুটি মার্চের শেষে, আর আমি ঘরে বসে বসে ডুগডুগি বাজাব তা তো হতে পারে না। দূরে কোথাও না হোক অন্তত কাছেপিঠে, এই ধর দিঘা। এই অবধি গিয়েই থামতে হল, কারণ অর্ধাঙ্গিনীর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, বছরে কতবার দিঘা যেতে হয়? এ প্রশ্নের কোন উত্তর হয় না। নিরুত্তর রইলাম।
আপত্তির প্রথমতম ও প্রধানতম কারণ - গ্রীষ্ম। যেন ভারতবর্ষে গ্রীষ্ম এই প্রথমবার এল। তাছাড়া দোলের দিন বিমানবন্দর থেকে পুত্রকে আনতে হবে, ওদিন ড্রাইভার পাওয়া যাবে না। তারপর আজ এই কাল ওই তো লেগেই আছে। তাহলে কোথায় যাওয়া যেতে পারে, স্বল্প দূরত্বের মধ্যে, সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফেরা যাবে এমন কোনও জায়গা?
ভেবেচিন্তে একটা জায়গার কথা মনে পড়ল - দাঁতনের বৌদ্ধ বিহার-এর ধ্বংসাবশেষ ও তার সাম্প্রতিক উৎখননস্থান। খবরের কাগজে মধ্যে-মধ্যেই পড়ছিলাম। অনেকদিন ধরে যাব যাবও করছিলাম। কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠছিল না, প্রধানত সঠিক পথনির্দেশের অভাবে। তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে শেষে একাকী বেরিয়ে পড়া গেল শনিবার ছাব্বিশে। সকাল সকাল বেরিয়ে খড়্গপুর। সেখান থেকে ৯-২৫ এর ৬৮০২১ খড়্গপুর বালেশ্বর মেমু ধরে হিজলি, বেনাপুর, নারায়ণগড়, বাখরাবাদ, বেলদা হয়ে, কেলেঘাই ব্রহ্মচারী পেরিয়ে, সোয়া দশটায় নেকুরসেনি। ষ্টেশনটি ছোট, সারাদিনে কয়েকজোড়া রেলগাড়ি মোটে থামে। তিনটে প্ল্যাটফর্ম, চারটে লাইন, আর সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মস্ত মস্ত গাছ। এই শেষ বসন্তে সেখানে লাল আর হলুদের যুদ্ধ চলছে যেন। মধ্যস্থতা করার জন্য তারই মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ সাদা। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

(২)

দাঁতনের ইতিহাস বর্ণাঢ্য। একদা এ অঞ্চল ছিল ওড়িশার গণপতি রাজাদের করদ রাজ্য হিজলি রাজের অন্তর্গত। জগন্নাথ সড়কের ওপরে হওয়ায় তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে সবসময় জমজমাট। কলকাতা-পুরী জগন্নাথ সড়ক ১৭০০ সাল থেকেই মোটামুটি রূপ নিতে থাকে। ১৮২৫-এ গিয়ে এর নাম হয় ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড, কিন্তু পুরনো নাম চলতেই থাকে। রাস্তার দুধারে গজিয়ে উঠতে থাকে তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা প্রদানকারী ব্যবস্থাদি - ধর্মশালা, সরাইখানা, দিঘি, সেতু, ঘাট। চৈতন্যদেব, নানক, কবির এই পথ দিয়েই জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। মারাঠারা, পরে ইংরেজ, রক্ষনাবেক্ষণের জন্য এই পথে টোল বসায়। ১৮৯৭-এ পুরী রেলস্টেশন চালু হলে এই পথ গুরুত্ব হারায়। তবু সড়কের ধ্বংসাবশেষ উৎসাহীর চোখে আজও ধরা দেয় - ৫১০ কিলোমিটার পথের মধ্যে ১৬৮ কিলোমিটার পথ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। ১৭৭১-এ ব্রিটিশ খাজনার খতিয়ানে দেখছি দাঁতন সরকার জলেশ্বর-এর এক পরগনা। মোগলমারির বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত ২০০২-এ, কিন্তু মৌখিক ইতিহাস দাবি করে যে দাঁতন নামের উৎসমুখ দন্ত, কারণ ওই মহাবিহারে শাক্যমুনির দন্ত রক্ষিত হয়েছিল।
পদসেতু পেরিয়ে বাইরে। জাতীয় সড়ক, মতান্তরে জগন্নাথ সড়ক তথা ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড পাশ দিয়েই। কোনরকম যানবাহনের দেখা যখন মিললই না, হাঁটা ছাড়া আর গতি কি! আর হাঁটতে আমার কোন আপত্তি কোনকালেই নেই। বাঁয়ে জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা হেঁটে মোগলমারি মোড়। সেখান থেকে ডাইনে ঘুরে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে মোটামুটি তিনশো মিটার হাঁটলেই বৌদ্ধ বিহারের সাম্প্রতিক উৎখননস্থান। উৎখননের কাজ চলছে।

(৩)

আমাদের মধ্যে যারা সুবোধ ঘোষের কিংবদন্তীর দেশে পড়েছি,তাদের সখিসেনার সঙ্গে পরিচয় আছে। সুবোধবাবু দেখে যেতে পারলেন না, পাঠশালার সেই ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করে পরবর্তী প্রজন্ম খুঁজে পেয়েছে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চালু থাকা এক বৌদ্ধ মহাবিহার, এক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। লোকায়ত কৌম জনবিশ্বাস ও মৌখিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এক অনন্য অভিজ্ঞান।
মহাবিহারটির উৎখনন ও প্রাসঙ্গিক অনেক তথ্যই আন্তর্জালে প্রাপ্তব্য। আমি শুধু এইটুকুন বলে থামি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আমি এই ভেবে শিহরিত হচ্ছিলাম যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তের শতক আগে এইখানেই দাঁড়িয়ে এক শ্রমণ উচ্চারণ করেছিলেন 'পনতিপতত ভেরামানি সিকখাপদম সমাদিয়ামি' - আমি জীবন বিনষ্ট না করিবার অঙ্গীকারবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় উৎখননের কাজ চলছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে পুরনো ইটের স্তরবিন্যাস নজরে আসে। মস্তিষ্কে আসে চিত্রকল্প, অনেক অনেক বছর আগে, ধরণী যখন তরুণী ছিলেন, এই প্রাঙ্গণ ছিল ভিক্ষু শ্রমণ অধ্যুষিত এক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র, দীপালোকে আলোকিত, ত্রিশরণ মন্ত্রে মুখরিত। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি - আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। ধম্মং শরণং গচ্ছামি - আমি ধর্মের শরণ নিলাম। সংঘং শরণং গচ্ছামি - আমি সংঘের শরণ নিলাম।:বুদ্ধ যিনি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, (অমিতাভ) বা বোধিলাভ করেছেন। আক্ষরিক অর্থে "বুদ্ধ" বলতে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত,উদ্বোধিত,জ্ঞানী,জাগরিত মানুষকে বোঝায়। ধম্ম অর্থাৎ বুদ্ধের শিক্ষা,অর্থাৎ যে সাধনা অভ্যাস দ্বারা সত্য লাভ হয়,হয় আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ। সংঘ, যেখানে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মের সাধনা সম্যকভাবে করা যায় তাই সংঘ।

বৌদ্ধধর্মে আমার আকাদেমিক উৎসাহ অনেকদিনের। তার একটি সম্ভাব্য কারণ আমার ছোটবেলা কেটেছে দূরপ্রাচ্যে, মন্দিরের বদলে প্যাগোডা দেখে, শিব অথবা কালীমূর্তির বদলে বুদ্ধমূর্তি দেখে, পরবর্তীকালে কলেজ গমনকালে বুদ্ধের দুঃখশূন্য এক জগতের স্বপ্ন আমাকে বড় টেনেছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব বিষয়ে শাক্যমুনির নীরবতা, মধ্যপন্থা অবলম্বন নির্দেশ, কৃতকর্ম পর্যালোচনা.....আমার মনে হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম যথার্থভাবে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের ধর্ম, যে মানুষ তার কৃতকর্মের দায় অচেনা অদেখা কোন ঈশ্বরের ওপর চাপায় না, প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তমনস্ক সাবালকের মত নিজে বহন করে। বয়স বাড়লে আত্মবিশ্বাস কমে আসে, কোন কাজ করে ঠিক করলাম না ভুল করলাম সন্দিগ্ধতা চেপে বসে, কৃতকর্মের দায় দুর্ভার মনে হয়, তখন আঁকড়ে ধরার মত একটা অবলম্বন দরকার হয়।

বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা সর্ব দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য, নির্বাণলাভ। নির্বাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিভে যাওয়া, বিলুপ্তি,বিলয়,অবসান। এই সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চারটি উপদেশ পালিঃ চত্তারি আর্য্য সত্যানি। তিনি অষ্টবিধ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা(পালি ভাষায় মজঝিম পটিপদা) অবলম্বনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন,মানুষ যখন অহরহ বিভিন্ন দুঃখের শৃঙ্খলে আবদ্ধ,তখন দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণের পথ না খুঁজে তত্ত্বালোচনা মুর্খতা। তাই অতীন্দ্রিয় জগত,ঈশ্বর,আত্মার অমরত্ব ইত্যাদির চেয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে মানুষের দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ লাভের পন্থা উদ্ঘাটনে অধিকতর আগ্রহী।

ঘুরে ফিরে দেখা হল। এবার কিছু ছবি তোলা দরকার, নইলে লোকে বলবে কি? কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখা গেল চারিদিকে ছবি তুলবেন না বিজ্ঞপ্তি। একজনকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম দাদা দুটো ছবি তুলব? তিনি ডিরেক্টরকে দেখিয়ে দিলেন। ডিরেক্টর সাহেব টুপি পরে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। কাছে গিয়ে সবিনয়ে অনুমতি চাইলাম। বিস্তর জেরার পর আমার পরিচয় নিয়ে নিঃসংশয় হয়ে তিনি শুধু যে অনুমতি দিলেন তাই নয়, লোকজন ডেকে তালা খুলিয়ে গ্যালারি ও জাদুঘর দেখিয়ে দিলেন। সর্বোপরি, স্থানটির ইতিহাস, উৎখননের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে অনেক কথা বললেন। তাঁকে আমার নমস্কার। উৎখননে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির বাসন, পোড়ামাটির সিল, গুপ্ত-পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ ধাতব সিল, নিবেদনস্তুপ (votive), সোনার মুকুট... এইসব।

(৪)

ইতোমধ্যে ডিরেক্টর সাহেবের বদান্যতায় একটি টোটো গাড়ি জুটেছে। সারথিটি গাড়ি রেখে সানকিতে ঘুগনি মুড়ি খাচ্ছিলেন, তাঁকে বলা হলো আমার পরবর্তী গন্তব্য। ১। শরশঙ্খ দিঘি। রাজা শশাঙ্কের খনিত বলে জনবিশ্বাস। পিতামহ ভীষ্ম নাকি এখানেই শরশয্যায় পতিত হয়েছিলেন। ২। কুরুমবেরা দুর্গ। ওড়িশার সূর্যবংশীয় গণপতি রাজাদের নির্মিত। ১৪৩৮ - ১৪৬৯। ৩। মনোহরপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ১৫২৮ সালে নির্মিত বলে জনশ্রুতি।

কিন্তু সারথিটি কিঞ্চিৎ বেয়াড়া। তাঁকে যতই বোঝাই যে আমি ভবঘুরে বাউন্ডুলে লোক, বাড়ি ফেরার কোন তাড়া নেই, দরকার হলে রাতে স্টেশনে

শুয়ে থাকব, ততই সে আমাকে ১-৫৩ র বালেশ্বর খড়গপুর মেমুগাড়িটি ধরাতে চায়। পরে বোঝা গেল, তাঁর গাড়িটি নির্বাচনের কাজে নেওয়া হয়েছে; তার মধ্যেই সে আমাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি...। কিন্তু কি আর করা! শরশঙ্খ দিঘি বা কুরুমবেরা দুর্গ এযাত্রায় যাওয়া হল না। পরিবর্তে সারথি মহোদয়ের প্রবল উৎসাহ কাঁকড়াজিৎ গ্রামের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু মন্দির দেখাতে। যতই বলি নবনির্মিত মন্দির আমাকে টানেনা, অন্তত শতাব্দীপ্রাচীন না হলে মন্দির আমার কাছে মন্দিরই নয়, বাণিজ্যস্থল; তবু সে নাছোড়। চোখ বড়-বড় করে গল্প শোনায় ছোট পর্দার কোন অভিনেতা একবার এতদঞ্চলে শুটিংয়ে এসে জুতো না খুলে ওই মন্দিরে ঢুকেছিলেন, ব্যস! পরদিন থেকে তাঁর গলা ভেঙে দ। রুটি রুজি বন্ধ। আবার এসে মহাপ্রভুর কাছে ক্ষমা টমা চেয়ে তবে শান্তি, স্বর ফিরল, রুটি রুজিও। সতত ক্ষমাশীল মহাপ্রভু, যিনি জগাই মাধাইকে কলসির কানার বদলে প্রেম দিতে পারেন, তিনি যে এত আত্মম্ভরী ও অসূয়াপ্রবণ হতে পারেন না, তা বোঝানো গেল না। বাঙালি চিরকালই উগ্রচণ্ডা কাঁচাখেগো দেবতার থানে নৈবেদ্য চড়াতে ভালোবাসে কিনা! শীতলা, কালী, পঞ্চানন্দ... ।

তা মস্ত মন্দিরটি দেখা হল শেষ পর্যন্ত। ফেরার পথে মনোহরপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অনাবাদী বনস্পতিবহুল জমির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুটি অতিকায় (আনুমানিক ৩০' x ৫' x ২') স্তম্ভ। দেখে বোঝা যায় বৃটিশ পুর্ববর্তী যুগের, pilaster ধাঁচের নয় এগুলি, বরং বর্তুলাকার। ১৬৩৪ সালে জন (ইস্ট ইন্ডিয়া) কোম্পানি বাংলায় ব্যবসা করার অধিকার পায়। ১৬৯০ এ কলকাতায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন, ১৭৫৭-য় পলাশী। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গনির্মাণ ওই সময়কালের সম্ভাব্যতার বাইরে। ফলে যখন শুনলাম দুর্গের নির্মাণকাল ১৫২৪, অবিশ্বাস হয়নি। গৃহস্বামীর অনুমতি নিয়ে কিছু ছবি তোলা হল। সন্নিহিত ভবনটিতে বর্তমানে লোকজন বাস করেন। ঐতিহ্যের ষষ্ঠীপূজা করে শরিকির অংশে অংশে নতুন নির্মাণ। সহৃদয় পরিবারটি বাড়িটির পুরনো অংশের ঘরগুলি ঘুরে দেখতে দিলেন, ছবি তুলব না এই শর্তে।

তখন দুপুর। রোদ বেশ চড়া, অলস মধ্যাহ্নে পুকুরের জলে কাঁপন উঠছে, পায়ের নীচে শুকনো পাতা মড়মড় করে ভাঙছে, বুকে হেঁটে চলে যাচ্ছে গিরগিটি, উড়ছে প্রজাপতি, একটা বেজি জিজ্ঞাসু চোখে আমাকে দেখে নাবাল জমিতে নেমে গেলো। নেপথ্যে একটা কোকিলের ডাক এই বসন্তে বেশ জুতসই হত - কিন্তু কৃষিকাজে জৈব সারের প্রচলন বাড়ায় গ্রামাঞ্চলে এখন জৈব বর্জ্য বস্তুত নেই। ফলে কাকেরা দেশান্তরী, কোকিলের মত ফলাহারী পক্ষীও, পরভৃত পরভৃৎ সম্পর্কে, আজ শহরবাসী। খেতে না পাই সেও ভাল, বংশরক্ষা তো হবে!

যারা এই দুর্গ বানিয়েছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টি কি এই সম্ভাব্যতা ছুঁয়েছিলো যে পাঁচ শতক পরে কালস্রোতে ভেসে যাবে বজ্রসুকঠিন রাজশক্তি, শুধু এক অকালপক্ক পল্লবগ্রাহী অলস দুপুরে সরীসৃপসান্নিধ্যে ঘুরে বেড়াবে একা একা!

(৫)

এবারে ফেরার পালা, কারণ বালেশ্বর খড়্গপুর মেমুগাড়িটি নেকুরসেনিতে আসে ১-৫৩য়। স্টেশনে টিকিট কাটতে গিয়ে আরেক বিস্ময়। হাতে পেলাম এক টুকরো ইতিহাস। ওই স্টেশনে থেকে অদ্যাবধি Edmondson Ticket দেওয়া হয়। গন্তব্যের নামে শুধু বাউড়িয়ার বদলে বাউড়িয়া জংশন। সেই কবে কোন কালে সাহেবরা ভেবেছিলেন সেতু বানিয়ে বাউড়িয়ার সঙ্গে যুক্ত করবেন বজবজকে। সেই স্বপ্নের উত্তারাধিকার টিকিটে বাউড়িয়া জংশন। নেকুরসেনিতে থেকে বাউড়িয়ার ১৩৮ কিলোমিটার পথের ভ্রমণদক্ষিণা তিরিশ টাকা। স্টেশনে কেউ কোথাও নেই। শুধু এক খালাসি না থেমে চলে যাওয়া রেলগাড়িগুলিকে সবুজ পতাকা দেখান।

মেমুগাড়ি এল। চড়ে বসা গেল। এমনকি জানালার ধারে সিটও পাওয়া গেলো।খড়্গপুরে নেমে মধ্যাহ্নভোজ। তারপর চারটের এমু। বাড়ি সাতটায়।

গ্রন্থঋণঃ

১। কিংবদন্তীর দেশে, সুবোধ ঘোষ। কলিকাতা নিউ এজ পাবলিশার্স। ১৯৬১
২। Dictionary of Historical Places. Bengal. 1757 -1947. Department of History, Jadavpur University. PRIMUS BOOKS
৩। Hanh, Thich Nhat (1991)। Old Path White Clouds: walking in the footsteps of the Buddha। Parallax Press। পৃ: 157-161। আইএসবিএন 0-938077-26-0।

পুনশ্চ:
পথনির্দেশটুকু দিয়ে দায়িত্ব সারি। আমি বাউন্ডুলে লোক, গিয়েছিলাম খড়্গপুর থেকে ৯-২৫ এর মেমু ধরে। নেকুরসেনিতে নেমে পদব্রজে। তবে রোদ্দুর আছে, আছে বৃষ্টি। শহুরে ভ্রাতা-ভগিনীদের শুনি অনেকেরই হাঁটুতে ব্যথা, তাই বলি কি সকাল ছটায় হাওড়া থেকে ধৌলি ধরে বেলদায় নামুন, কারণ নেকুরসেনিতে কোন যানবাহন পাওয়া যায় না। বেলদায় থাকার মত হোটেলও পাবেন। ওখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে দেখে নিতে পারেন কাকরাজিতের মহাপ্রভু মন্দির, মনোহরপুরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ,শরশঙ্কের দিঘি, সুবর্ণরেখার সূর্যাস্ত।
ফেরাও ওই ধৌলিতেই। বা ইচ্ছা হলে একরাত থেকে পরদিন ফিরতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ইটাচুনার রাজকাহিনি

সঞ্চিতা পাল

খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা।১৭৪০ সাল।সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাব হয়েছেন।সরফরাজের শ্যালক রুস্তম জঙ্গ ছিলেন ওড়িশার নায়েব নাজিম।তিনি ভগ্নিপতি হত্যার প্রতিশোধ নিতে আলিবর্দিকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু বালেশ্বরের কাছে এক যুদ্ধে রুস্তম আলিবর্দির কাছে পরাজিত হন।ওড়িশার মসনদে বসলেন আলিবর্দির ভাগ্নে। বিজয়ী আলিবর্দি খুশিমনে রওনা দিলেন মুর্শিদাবাদে নিজের রাজধানীতে।এদিকে রুস্তম জঙ্গও নিজের রাজত্ব ফিরে পেতে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। এবার আর একা নন। নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের সাহায্য প্রার্থী হলেন রুস্তম। মারাঠা শক্তির সহায়তায় ফের ওড়িশার নায়েব নাজিম হলেন রুস্তম জঙ্গ।

বাংলা-বিহার-ওড়িশার আকাশে দেখা দিল দুর্যোগের কালো মেঘ। মারাঠারা বুঝে নিল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে রয়েছে অশেষ সম্পদ। তা লুটে নেওয়াও খুব সহজ। এর পর থেকেই নিয়মিত মারাঠা বর্গির হানা শুরু হল বাংলায়।ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে হুগলি জেলায় চুঁচুঁড়া, সপ্তগ্রাম, আরামবাগ, পান্ডুয়া ইত্যাদি অঞ্চল তছনছ করে দিয়েছিল বর্গিরা। তবে কয়েকটি অঞ্চলে বর্গিরা হারও মেনেছিল। যেমন বাঁশবেড়িয়ায়।আর একটি বাধা বর্গিরা টপকাতে পারেনি, সেটি হল গঙ্গা। পাঞ্চেত দিয়ে ঢুকে তারা যাবতীয় অত্যাচার চালাত গঙ্গার এপারেই। ১৭৫১ সাল পর্যন্ত বর্গিদের এই অত্যাচার চলে। শেষ পর্যন্ত বাংলার নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর শান্তি ফিরে আসে বাংলায়।

এই বর্গিদের একটা অংশ থেকে গিয়েছিল এই উর্বরভূমিতে। পরে হুগলি জেলার সেই গ্রামের নামকরণ হয় বর্গিডাঙা। ইটাচুনার পাশের গ্রামটাই হল বর্গিডাঙা। সেখানে রাধামাধব কুন্দন নামে এক বর্গিসেনা বসবাস শুরু করেন। কেন রাধামাধব বাংলায় থেকে গেলেন তা জানা যায় না। এই রাধামাধব কুন্দনই হলেন ইটাচুনার কুন্ডু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।কুন্দন পদবী ধীরে ধীরে বাংলার মানুষের মুখে হয়ে যায় কুন্ডু। তবে এই কুন্ডু আমাদের বাংলার কুন্ডু নয়। যাইহোক,রাধামাধব সেখানে চাষবাস শুরু করে থিতু হলেন। রাধামাধবেরই এক বংশধর স্বপ্নে দেখেন,কাছেই ইটাচুনা গ্রামে অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছেন তাঁদের ইষ্টদেবতা শ্রীধর জিউ। বিগ্রহ উদ্ধার করে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সেই মন্দিরকেই কেন্দ্র করে তৈরি হল বাড়ি। রাধামাধবের এক বংশধর সাফল্যরাম ১৭৬৬ সালে রাজবাড়িটি গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য জায়গা থেকে বিভিন্ন পেশার লোকজন এসে গড়ে ওঠে ইটাচুনা গ্রাম। এ তো গেল অতীতের কথা। এবার বর্তমানে ফিরি। খন্যান স্টেশনে হাওড়া-বর্ধমান লোকাল ট্রেনটা থামল সকাল সোয়া নটায়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে টোটো করে মিনিট বারো যেতেই পৌঁছে গেলাম ইটাচুনা রাজবাড়ি।বাড়ির সিংহদরজায় দারোয়ান আছে। আমাদের দেখে দারোয়ান অফিসে গিয়ে বসতে বললেন। ম্যানেজার সঞ্জয়বাবু পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখাবেন। তবে তাঁর আসতে একটু দেরি আছে। বনেদিয়ানায় ভরপুর রিসেপশনটা।

সুরকি ও ঘেঁস দিয়ে পাতলা ইটে গাঁথা বিরাট দোতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলো প্রায় ২০ ইঞ্চি পুরু। সিংহদরজা পেরিয়ে ভিতরবাড়িতে ঢুকতে গেলে আগে থেকে বুকিং থাকতে হবে। তা না হলে, নো এনট্রি। ফটকটা প্রায় দুমানুষ সমান উঁচু। শাল ও সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি। তার ওপর লোহার কিলক গোঁজা। সঞ্জয় বাবু আসতেই আমরা ঢুকে এলাম বাড়ির ভিতরে। বিশাল উঠোন পেরিয়ে শ্রীধর জিউয়ের মন্দির। উঠোনের পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম রাজবাড়ির অন্দরমহলে। চারপাশে ঘর দিয়ে ঘেরা মাঝে উঠোন। নীচের তলার ঘরগুলো আগে ছিল বাড়ির কাজের লোকেদের। বাড়ির নানা কোণে অসংখ্য সিঁড়ি। যেন ভুলভুলাইয়া, একা কেউ চিনে বেরিয়ে আসতে পারবে না। দোতলার ঘরগুলো বর্তমানে গেস্টরুম করা হয়েছে। বাড়ির পিছনে বাগান আর পুকুর। নির্মাণশৈলীতেও রয়েছে প্রাচীনত্ত্বের ছোঁয়া। বেশিরভাগটাই অবশ্য ইউরোপীয়ান স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি।

বাড়ির মাথায় খোদাই লেখা দেখে বোঝা যায় যে, ১৭৬৬ সালে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপরও দুবার বাড়িটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল। একবার ১৮৯৬ সালে নারায়ণ কুন্ডুর আমলে,আর একবার বিজয়নারায়ণ কুন্ডুর আমলে।এই বিজয়নারায়ণ কুন্ডুই পরিবারের সবচাইতে সফল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতা বলে ইংরেজ আমলে ব্যবসা করে সাফল্য পান। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ঠিকাদারির কাজ করতেন বিজয়নারায়ণ। সঞ্জয়বাবুর কথায়,অসম বা বিহারের কোনো একটা দিকে রেললাইন পাতার সময় মাটি খুঁড়ে প্রচুর ধনসম্পদ পান তিনি। এই ধনসম্পদ দিয়েই বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেন। শোনা যায়,তাঁর আমলেই কুন্ডু বাড়ি বিখ্যাত হয়ে ওঠে।তিনি রায় বাহাদুর উপাধিও পেয়েছিলেন। রাজবাড়ির গল্প শুনতে শুনতে,অলিন্দে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ছাতের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়িটা অদ্ভুত। অনেকটা লম্বা, টানা সিঁড়ি। ছাতটাও বিশাল। গাছে ঘেরা। ছাতের পাঁচিলও প্রায় এক মানুষ লম্বা। ছাত থেকে চারপাশের সবুজ গ্রাম দেখতে বেশ লাগে। পুরো রাজবাড়িটা মোট আঠারো বিঘা জমির ওপর নির্মিত। দশ বিঘা জমিতে শুধু বাড়িটাই। বাকিটায় বাগান, পুকুর গোলা ইত্যাদি। বেশ কিছুটা সময় ছাতে কাটিয়ে নিচে নেমে এলাম।

বাড়ির পিছনে সুন্দর বাগান আর একটা পুকুর। আগে পুকুরটা রাজবাড়ির লোকেদের স্নানের কাজে ব্যবহার হত। সম্প্রতি বাগানে দুটি কটেজ করা হয়েছে,হোম-স্টে হিসাবে। পুকুরে বিকেলে মাছ ধরারও ব্যবস্থা আছে। পুরোনো গাছগুলো দেখলে বোঝা যায়, তারা ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। বাগান ঘুরে আমরা আবার শ্রীধর জিউয়ের মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। ম্যানেজার বাবু বললেন, চলুন সংগ্রহশালা আর বৈঠকখানা ঘর দেখে আসি। ওপরে দোতলার বারান্দার পাশে রাজবাড়ির সংগ্রহশালা। সেখানে রাজবাড়ির ব্যবহৃত বাসন-কোসন, পূজার পাত্র, বিবিদের পান-সামগ্রী, প্রথম এ.কে. ৪৭ রাইফেলের মডেল, চাবুক ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। আর রয়েছে বড়লাটের উপহারের স্বরূপ বিজয়নারায়ণকে দেওয়া তলোয়ার। সেখানে আছে একটা সিন্দুকও। বর্তমান মালিক ধ্রুবনারায়ণ কুন্ডুর আমলে বাড়ির গোপন সুড়ঙ্গ পথ থেকে এই লোহার সিন্দুকটি উদ্ধার করা হয়। খানকতক কড়ি,তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই মেলেনি সিন্দুক থেকে। রাজবাড়ির বৈঠকখানা ঘরটি বিশাল। পুরোনো আসবাব,টানাপাখা,পুরোনো কার্পেট,মার্বেলের টেবিল দিয়ে সাজানো ঘরটি। অনেকের মতে,এটি নাকি রাজবাড়ির নাচঘর ছিল। এই বৈঠকখানা ঘরেই আছে সুড়ঙ্গ পথটা। ঘরের দুদিকের দুটি দেওয়ালের পিছনেই আছে সুড়ঙ্গ পথ। একটি পথ গেছে নীচের অফিসঘরে আর একটি গেছে খন্যান রেলস্টেশনের কাছে।

রাজবাড়ির মন্দির নিয়েও একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। কুন্ডুবাড়িতে কোনোদিনই শ্রীধর ছাড়া অন্য কোনও দেবদেবীর পুজো হয়নি। দিনে চারবার পুজো হয় শ্রীধরের।বিজয়নারায়ণের স্ত্রী স্বামীর কাছে অনুযোগ করে বলেন,শুধু শ্রীধরের পুজো হবে কেন? অন্যান্য দেব-দেবীরও পুজো হবে। স্ত্রীর অভিমানের কথা শুনে বিজয়নারায়ণ বাড়ির উল্টোদিকেই গড়ে তোলেন একটি শিবমন্দির। মন্দিরটি এখনও রয়েছে। তবে তার এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। অদ্ভুত এক শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শিব এখানে গোঁফওয়ালা।বসার ভঙ্গিটিও নতুনত্ব। ডান হাঁটু তুলে মাটিতে বসে আছেন দেবাদিদেব। মন্দিরটির নির্মাণশৈলীও তখনকার সময় বাংলায় যে রকম শিবমন্দির দেখা যায়,তার মতো নয়। সম্পূর্ণ অন্য। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের শিবমূর্তি চাই না - শিবলিঙ্গ চাই। এই শুনে বিজয়নারায়ণ কাশীতে এক ব্যক্তিকে শিবলিঙ্গ আনতে পাঠালেন। দিনের পর দিন কেটে গেল তিনি আর শিবলিঙ্গ নিয়ে ফিরে এলেন না।তারপর থেকেই মন্দিরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কোনোদিনও সেখানে পুজো হয়নি।

ঘড়িতে বেলা বারোটার ঘন্টা পড়ল। রাজবাড়িটা ঘুরে দেখতে দেখতে প্রায় দুঘন্টা কখন কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ঘরে ফিরে স্নান করে ফ্রেশ হতেই ডাক পড়ল লাঞ্চের। একদম রাজবাড়ির খাবার। এখানে থাকলে নিজেকে রাজা বলে মনে হবেই। আতিথেয়তায় কোনো খামতি নেই এদের। ঘরগুলোর নামেতেও বনেদিয়ানা। বড়বৌদি, ছোটবৌদি, পিসিমা, ভাইপো, ভাইঝি, ছোড়দি ইত্যাদি। রাজপরিবারের যারা যারা যে ঘরে থাকতেন, তাঁদের নামেই এই ঘরগুলো। সন্ধ্যায় শ্রীধরের আরতি দেখলে মন প্রসন্ন হয়ে যায়। দোলপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমীর দিন বড় পুজো হয় শ্রীধরকে ঘিরে। দোলের আগের দিন পালকিতে করে শ্রীধরকে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়।তারপর সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে হয় চাঁচর।

মাথার ওপর আধফালি চাঁদ। সকালের ব্যস্ততা নেই।অদ্ভুত নীরবতা চারিদিকে। দূরে বাঁশিওয়ালার মন কেমন করা বাঁশির ডাকটা বলছে, নিজের ঘরে ফিরতে হবে।

চন্দননগরের বাসিন্দা ইতিহাসের স্নাতকোত্তর সঞ্চিতা পাল ভালবাসেন বেড়াতে। শখ ফোটোগ্রাফি। ক্যামেরা হাতে কাছে-দূরে বেড়িয়ে পড়েন মন চাইলেই। পথের পশুদের সেবা করতেও ভালোবাসেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বিষ্ণুর উপত্যকায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

~ ~ হর কি দুন ট্রেক রুট ম্যাপ ~ হর কি দুন ট্রেকের আরও ছবি ~

"আজকে চল সেই আকাশে হাঁটি
যেখানে ছায়াপথ গিয়ে মেশে
আলো পথের সঙ্গে;
যেখানে সবুজ, নীল আর সাদায়
আকণ্ঠ পান করে বসে আছে নেশাতুর দেবতার দল-
ফিরতে চাওয়াটা যেখানে একান্তই
স্বার্থপর ক্লান্তির মতো..."

২৪ এপ্রিল ২০১৫, "এবার কাণ্ড উত্তরাখণ্ডে"

যারা আমার মতো পাহাড় ভালোবাসে তাদের মনকেমন কে আটকায়? কিছুদিন ছাড়া-ছাড়াই প্রেমিকার মতো একা-একা দেখা করতে চেয়ে সে ডাক পাঠায়। সেই ডাক উপেক্ষা করে কার সাধ্যি! পাহাড়-জঙ্গলে খুব ঠাণ্ডায় তুষারপাতে কিংবা খুব বৃষ্টিতে যখন মনে হয় আমরা কত অসহায় তোমার কাছে, তখনই কোনও এক বিস্ময়ে মুগ্ধ করে দিয়ে সব দুঃখ-কষ্ট এক ঝাঁকুনিতে ভুলিয়ে দিয়ে তুমি সামনে এসে হাজির হও। তোমার রাজ্যে পৃথিবী 'গদ্যময়' নয়, সত্যিকারের 'কাব্যময়'। আর সেরকমই এক রাজ্য উত্তরাখণ্ড - দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। যার প্রতিটা পথের বাঁকে শুনতে পাওয়া যায় অদ্ভুত এক স্বর্গীয় ধ্বনি। সেই উত্তরাখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত অপরূপ এক ভ্যালি 'হর-কি-দুন', সত্যিকারের 'স্বর্গের উপত্যকা'। দেবভূমিতে 'পদাতিক'-এর প্রথম অভিযান।

প্রতিবারের মতো এবারে ঠিক সেই উৎসাহটা আসছিল না। কোনও এক অজানা পিছুটান আটকে দিচ্ছিল। হয়তো আগামী দিনে আসতে চলা কোনও বিপদের আশঙ্কা মনকে দোলা দিচ্ছিল। হাফ-ডে অফিস সেরে রাত ৮.৩০ এর হাওড়া-দেরাদুন দুন-এক্সপ্রেস-এ উঠে পড়লাম আমি আর পদাতিকের কনিষ্ঠতম সদস্য আমার হৃদয়ের খুব কাছের বন্ধু নীলাদ্রি। আর একজন পাহাড় পাগল আর টিমের 'ট্রেক রিসার্চার' সৌনীপ উঠল ওর শহর শ্রীরামপুর থেকে ঠিক ৯ টায়। রাতের খাবার সঙ্গেই ছিল। এসি-থ্রি-টিয়ার কামরার একেবারে দরজার ধারে আমাদের সিট। সাইড আপারে শুয়ে অনেকবার দরজার গুঁতো খেতে হল আমায়। ঘুম আসছিল না। কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

যাত্রা শুরু

২৫ এপ্রিল, "ভূমিকম্প"

সকালবেলা ঘুম ভাঙল ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে।

ঘড়ির সঙ্গে টাইমটেবল মিলছে না। ট্রেন অলরেডি দু'ঘন্টা তিরিশ মিনিট লেট। আলোচনা চলছিল দুন এক্সপ্রেস তার 'লেট লতিফ' সুনাম বজায় রাখতে পারবে কি না এই নিয়ে। ট্রেন এগিয়ে চলেছে বেনারসের দিকে আর আমরা ক্যামেরা হাতে তৈরি হচ্ছি বিখ্যাত বেনারসের ঘাটের এক টুকরো ছবি তোলার জন্য, ফোনের নেটওয়ার্ক আবার থ্রিজি দেওয়া শুরু করল। ইন্টারনেট অন করতেই ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপে পরপর নোটিফিকেশন আসা শুরু হল। বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেছে নেপাল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক অংশ। ফেসবুকের ওয়াল ছেয়ে গেছে পোস্টে। সবার একটাই প্রশ্ন - "ফোনে পাচ্ছি না, তোরা ঠিক আছিস"? সবাইকে কুশল সংবাদ দেওয়া শেষ হতেই গাইডকে ফোন করার চেষ্টা করতে থাকলাম। এবারের ট্যুরের ক্যাশিয়ার কাম ম্যানেজার কাম কমিউনিকেটর সব দায়িত্বই আমাকে সামলাতে হচ্ছিল। গাইড বল বাহাদুর এর সঙ্গে কথোপকথন এবং সমস্ত নিগোশিয়েশন করেছিলাম নিজেই। অনেক কষ্টে ফোনে ধরা গেল তাকে। নিজস্ব নেপালি মেশানো হিন্দিতে সে জানাল উত্তরাখণ্ড বিপন্মুক্ত। ভূমিকম্প সেখানে কোনও প্রভাব ফেলেনি। সবার বাড়ি থেকে আতঙ্কিত ফোন আসতে লাগল ফিরে আসার প্রবল আকুতি আর ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল-সহ। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। পনের হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া ছিল, আর আরও অনেক খরচ অলরেডি হয়েই গেছে। তিন জনে বসে ঠিক করলাম দেরাদুন নেমে আগে GMVN (Garhwal Mandal Vikash Nigam Ltd.)-এ খোঁজ নেব। ট্রেন থেকেই যতদূর সম্ভব ফোনে খোঁজ খবর নেওয়া হল। যা হয় হবে ভেবে রাতের খাবার খেয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পুরোলা

২৬ এপ্রিল, "রোড ট্রিপ"

সিঙ্গললাইনে ঢোকার পর থেকেই ট্রেনের গতি মন্থর। একটা সময় ৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট লেটে চলছিল। হরিদ্বার পৌঁছালাম সকাল ৯টায়, যেটা ঢোকার কথা ছিল ভোর ৪.৩৫-এ। কখন পৌঁছাব তাই ভাবছিলাম। আদৌ ট্রেকটা করা সম্ভব হবে কি না তাই নিয়েই একরাশ ধোঁয়াশা। অনেক নাকানি-চোবানি খেয়ে ঠেলে-গুঁতিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ ট্রেন দেরাদুন পৌঁছাল। জানুয়ারিতেই দেরাদুন এসেছিলাম। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে খোঁজ নেওয়াই ছিল। একটা ইন্ডিকা বুক করে নেওয়া হল পুরোলা পর্যন্ত। রাস্তা মুসৌরি হয়ে। দেরাদুন ছাড়িয়ে মুসৌরি রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে "টপকেশ্বর মন্দির"-এর একটু আগে এক ধাবায় লাঞ্চ সেরে দীর্ঘ সাড়ে চার ঘন্টার রোড ট্রিপ শুরু হল। বিকেল ৫.৩০ নাগাদ যখন পুরোলা পৌঁছালাম হাল্কা মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। পাহাড়ের দুঃখে আকাশেরও মুখ ভার। ওখানে গিয়ে দেখা হল আমাদের টিমের সঙ্গে। সবার পোশাক এবং চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চারজন পোর্টার এবং আমাদের গাইড বল বাহাদুর। কোনও ভক্তি হল না। তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হতাশ হয়ে পড়লাম। হোটেলে স্যাক নামিয়ে ছাদে গেলাম। পুরোলা বেশ বড় টাউন। জনবহুল এবং ভারি ছিমছাম। নিজেদের কয়েকটা ছবি তুলে বেরোনো হল টহল দিতে। নিভে আসা আলোয় গোলাপি সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে টন্স নদীগর্ভে নেমে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম সবাই মিলে। হোটেলে ফেরার পর বাহাদুরজি এলেন র‍্যাশন কেনার ফর্দ নিয়ে। টাকা দিয়ে দিতে উনি বললেন - "জি স্যার আপলোগ চিন্তা মত করো হাম সব অ্যারেঞ্জ কর লেঙ্গে"। কী আরেঞ্জমেন্ট হল সেটা জানতে পারলাম না। রাত্রে ৫০ টাকার ভেজ মিল খেয়ে হাল্কা পায়চারি করে শুয়ে পড়লাম ১০টা নাগাদ।

২৭ এপ্রিল, "রোড টু এল-ডোরাডো"

সকাল ৯ টায় বাস ছাড়বে সাঁকরি যাওয়ার। ঘন্টা চারেকের রাস্তা। মোরি অবধি রাস্তা ভালো। তারপর খুব খারাপ। ২০১৩-র ভয়াল বন্যায় রাস্তার খুব খারাপ অবস্থা। ২০১৩-কে উত্তরাখণ্ড সরকার "দৈবী আপদা বর্ষ" বলে ঘোষণা করেছে। অনেক জায়গায় এই লেখা বোর্ড চোখে পড়ল। এর আগে কখনও পাহাড়ি রাস্তায় বাসে চড়িনি। পাহাড়ি গ্রাম্য মানুষজন, তাদের ছাগল-মুর্গি, নাক থেকে হলুদ সর্দি বেরোনো গোলাপি গালের নাকবোঁচা স্কুলের বাচ্চা, সবার সঙ্গে অদ্ভুত গন্ধ নাকে নিয়ে সে এক রোমাঞ্চকর যাত্রা। পুরোলা থেকে সাঁকরি বাসে ১৮০ টাকা ভাড়া। মুস্কিল হচ্ছিল এটাই যে শুধু আমরা তিন জন নয়, বাকি পাঁচজনের সমস্ত খরচও আমাদেরকেই দিতে হচ্ছিল। মোরি ছাড়ানোর কিছুক্ষণ পর বাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই আমাদের তিন জনের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। আমার সামনের সিটে বসা ভদ্রলোক বললেন -"আপ লোগো কো নিচে উতরনা পড়েগা। ফরেস্ট চেকপয়েন্টমে ভেরিফিকেশন হোগা"। আমরা তিন জন আর বল বাহাদুর নেমে পড়লাম। এখান থেকে 'গোবিন্দ ন্যাশানাল পার্ক'-এর এলাকা আরম্ভ। হর-কি-দুন ভ্যালি এর মধ্যেই পড়ে। তাই পারমিশন নেবার দরকার পড়ে, সঙ্গে ট্যাক্স এবং সিকিউরিটি ডিপোজিট। আমাদের তিন জনের এবং জিনিসপত্রের জন্য ছ'দিনের ৯০০ টাকা দিতে হল। সঙ্গে ৬০০ টাকা এক্সট্রা, যেটা আবার ফেরার পথে ফেরত পাওয়া যাবে।

দুপুর একটা নাগাদ সাঁকরি পৌঁছে গেলাম। চারদিক ঝকঝক করছে রোদে। পেটে একগাদা ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। আমাদের নাইট স্টে এখান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরের গ্রাম তালুকায়। ওখান থেকেই পরদিন আমাদের ট্রেক আরম্ভ। তালুকা যাবার সব গাড়ি প্রায় চলে গেছে। কিছু করার নেই আপাতত, এই ভেবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পাশের ছোট্ট একটা ঝুপড়ি হোটেলে খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। দুটো নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে বসেছিলাম। আকাশে হঠাৎ করে এক রাজ্যের মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিল। মনে হচ্ছিল আজ আর তালুকা পৌঁছাতে পারব না। রাস্তাও খুব খারাপ শুনেছিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা মিনি ট্রাক এসে হাজির হল। ৮০০ টাকার বিনিময়ে সে আমাদের পৌঁছে দিতে রাজি হয়ে গেল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল। ২ কিমি মতো যাওয়ার পরে বুঝতে পারলাম রাস্তা কতটা খারাপ। ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলাম। ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম যখন সামনে দেখলাম প্রায় ৬০ ডিগ্রি ঢাল বেয়ে এক সফেন ঝরনার মধ্যে দিয়ে গাড়িটাকে পেরোতে হবে। জলের স্রোত বেশ ভালোই। বেশ কায়দা করে অদ্ভুত দক্ষতায় ড্রাইভার জায়গাটা পেরিয়ে গেল। রাস্তা এমন যে হেঁটে যাওয়াই দুষ্কর, সেখানে গাড়ি চালানোতে কী পরিমাণ কলজের জোর লাগে আন্দাজ করে ড্রাইভার ছেলেটিকে কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করল। ১২ কিলোমিটার যেতে এক ঘন্টা লেগে গেল। মনে হল যেন হাজার বাধা পেরিয়ে একরকম অ্যাডভেঞ্চার করে জল-জঙ্গল-পাহাড় পথ পেরিয়ে আমরা দেখা পেলাম আমাদের "এল ডোরাডো" 'তালুকা'র।

বিকেল ৩.৩০ নাগাদ পৌঁছে একটা ছোট্ট হোটেলে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া গেল। GMVN গেস্ট হাউসের অবস্থা খুবই খারাপ। জল বা আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। ফরেস্ট বাংলোতে থাকতে গেলে আগেই দেরাদুন থেকে পারমিশন করাতে হয়, এটা ওখানে পৌঁছে জানলাম। বাংলোটা খুব সুন্দর কিন্তু থাকার উপায় ছিল না। তালুকা ওই প্রান্তের শেষ মোটোরেবল গ্রাম। জনসংখ্যা খুব বেশি হলে ৫০০-৬০০ হবে। ছবির মতো সাজানো আর মাঝখানে একটা ছোট্ট বৃষ্টি-পুষ্ট পাথরঘেরা লেক। গ্রামের বাইরে একটা ঝরনা আছে। সেখান থেকেই গ্রামের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা। আমাদের ভাগ্য খারাপ ছিল। আগেরদিন রাতেই ঝড়-বৃষ্টিতে পাথর গড়িয়ে পড়ে টারবাইন দেহত্যাগ করেছিল। ভেবেছিলাম আমাদের সমস্ত ক্যামেরা আর মোবাইল তালুকায় ফুল চার্জ করে নেব। আশা-নিরাশার সঙ্গে আপোস করে শুরু হল চার্জ বাঁচানোর যুদ্ধ। মোবাইল সুইচ-অফ করে আর ক্যামেরার ব্যাটারিগুলো খুলে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলাম সবাই, যাতে ঠাণ্ডায় তাড়াতাড়ি ডিসচার্জ না হয়ে যায়। বিকেল আর সন্ধেটা গ্রামের রাস্তায় পায়চারি করে আর কচিকাঁচাদের সঙ্গে ফোটো তুলে কেটে গেল। সন্ধেবেলা ওয়েদার ক্লিয়ার হবার পর গ্রামের বাইরের দিকে একটা টিলার ওপরে উঠে ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া গেল। বাড়িতে সবাই জানিয়ে দিলাম এরপর চার-পাঁচ দিন কোনও কথা হবে না, আর নেটওয়ার্ক থাকবে না। বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে বুঝতে পারছিলাম। একই রকম চিন্তায় আমরাও ছিলাম খবর দিতে পারব না বলে, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। ঠাণ্ডা ভালোই কামড় বসাচ্ছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় টর্চ জ্বেলে ফিরব ফিরব করছি তখনই নীচে নদীর গর্জ থেকে কয়েকবার টর্চ জ্বলা-নেভার একটা সিগন্যাল দিল কেউ। গতিক সুবিধের নয় বুঝে আমরা আর নিজেরা আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই হাঁটা দিলাম। হোটেলে ফিরে আমাদের কুক রনি আর মান সিং -এর বানানো অনবদ্য পরোটা, আলুর তরকারি আর আচার খেয়ে কম্বলের নরমে সেঁধিয়ে গেলাম। সৌনীপ বলল "ভাই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শেষবারের জন্য বিছানায় শুয়ে নে, গাঁতিয়ে ঘুমো"। কী আছে কপালে কে জানে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তালুকা গ্রামের পুকুর

২৮ এপ্রিল, "জঙ্গল ক্যাম্প"

রাত তিনটে নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বিদ্যুতের ঝলকানিসহ মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। সৌনীপ আর নীলাদ্রিও জেগে গেছিল। কীভাবে সকালবেলা বেরোনো হবে আর কীভাবে ওসলা পৌঁছোব বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের যাত্রাক্রম ঠিক করা ছিল। রেস্ট ডে মাত্র একদিন। কী যে হবে ভেবে খুব টেনশন হচ্ছিল। পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন বুঝিনি। বাইরে পাখির আওয়াজে বুঝলাম ভোর হয়ে গেছে। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে জানালার পর্দা সরাতেই মন ভালো করা একটা আলো চোখে এসে পড়ল। দরজায় 'টক-টক' করে দু'বার টোকা পড়ল। খুলে দেখি সদাহাস্যময় রনি প্লেটে চা আর বিস্কুট নিয়ে হাজির। 'গুড মর্নিং সাব' বলে সে জানিয়ে গেল ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে। খেয়ে বেরোনো হবে আটটা নাগাদ। ৮.১৫ নাগাদ জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আজকের গন্তব্য ১৪ কিলোমিটার দূরের গ্রাম ওসলা। প্রথম দিনের হাঁটা হিসেবে অনেকটাই। এই সুযোগে একটু ট্রেক আইটিনিরারিটা বলে নেওয়া যাক।

. তালুকা --> ওসলা/সীমা (নাইট স্টে) [১৪ কিমি]

- ওসলা/সীমা --> হর-কি-দুন (নাইট স্টে) [১২ কিমি]
- হর-কি-দুন --> যমদ্বার গ্লেসিয়ার---হর-কি-দুন (নাইট স্টে) [৪+৪=৮ কিমি যাতায়াত]
- হর-কি-দুন --> দেবসু থ্যাচ (নাইট স্টে) [১০-১২ কিমি]
- দেবসু থ্যাচ --> রুইনসারা লেক (নাইট স্টে) [১৩ কিমি]
- রুইনসারা লেক --> ওসলা/সীমা (নাইট স্টে) [১২-১৪ কিমি]
- ওসলা/সীমা --> তালুকা [১৪ কিমি]

হাঁটা পথ শুরু বন-বাংলোর পাশ দিয়ে। একটা পাথরে বাঁধানো, ভিজে স্যাঁতসেতে, একরাশ গোবরে ভর্তি ঢালু রাস্তা নীচে নদীর গর্ভে নেমে গেছে। এই টন্স নদীর

পাশ দিয়েই যেতে হবে আমাদের। টন্সের সংস্কৃত নাম তমসা, যদিও এই নামটা আর ব্যবহৃত হয় না। মোরি থেকেই সে আমাদের সঙ্গ দিয়ে চলেছে। রোদ উঠে হাঁটার আগ্রহটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। সদ্য গজানো কচি সবুজ পাইন পাতার গন্ধ নাকে আসছিল। এক কিলোমিটার মতো যাওয়ার পর চড়াই শুরু হল। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে প্রায় হাজার খানেক পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়ার পাল। ওদেরকে রাস্তা করে দিতে বেশ কিছুটা সময় গেল। কোনওমতে পাশ কাটিয়ে এগোতে থাকলাম নদীর পাশ বরাবর। ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল, কিন্তু রোদে হাঁটলেই ঘাম হচ্ছিল। সোয়েটার খুলে ঢুকিয়ে নিলাম সঙ্গের ন্যাপস্যাকে। ৬-৭ কিমি মতো আন্দাজ যাওয়ার পর একটা ছোট্ট অস্থায়ী ঝুপড়ি চায়ের দোকান নজরে এল। বল বাহাদুর সহ আমাদের বাকি টিম ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ করে মেঘ করে এসেছিল খুব, হাওয়াও দিচ্ছিল বেশ ঠাণ্ডা। জ্যাকেটটা বের করে পরে নিলাম। সবে যখন আবার হাঁটা শুরু করেছি, দু'-একটা বরফ ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা গা ছুঁয়ে গেল। মান সিং কে দাঁড় করিয়ে স্যাক খুলে রেনকোটগুলো বের করে নিলাম। এরকম ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হবে ভাবতে পারিনি। কিছুটা এগোনোর পরে সামনে তাকিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সামনে ধ্বস নেমে পুরো রাস্তা ধুয়ে চলে গেছে। বৃষ্টি আর বরফগলা জল হু-হু করে বয়ে চলেছে। আর পার হবার জন্য রয়েছে জলের তোড়ে ভেসে আসা একটা বিশাল বড় এবড়ো-খেবড়ো গাছের গুঁড়ি। ভয় করতে লাগল। বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে গুঁড়িটা। কম-সে-কম ১২ ফুট পেরোতে হবে। বৃষ্টি আর হাওয়াতে অবস্থা আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। এরকম অবস্থায় সাধারণত একজন এক্সপার্ট টিম মেম্বার রোপ নিয়ে পেরিয়ে গিয়ে উল্টোদিকে অ্যাংকর করে এবং দড়ি ধরে আস্তে আস্তে পেরোতে হয়। আমাদের গাইড এবং অন্য টিম মেম্বাররা অনেক আগেই পেরিয়ে চলে গেছিল। দড়ি-টড়িরও কোনও ব্যবস্থা নেই। অগত্যা নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রেখে আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় না দেখে তাই করলাম একে একে। উল্টোদিকে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সকলে। তখনও জানতাম না সামনে আছে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। ২০-৩০ মিটার যাওয়ার পর একটা বড় পাথরের বাঁক ঘুরতেই দেখি নীলাদ্রি সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাত দেখিয়ে থামতে বলছে। বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সামনে তাকিয়ে রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। একটা ঝুরো লুজ পাথরে ভর্তি ধসে যাওয়া জায়গা সোজা উঠে গেছে প্রায় ৭০০ ঢালে। সেখান দিয়ে নেমে আসছে একরাশ বৃষ্টির জল। পাশে পড়ে আছে একগাদা মৃত গাছের কঙ্কাল। সাইডে কোনও পাথরের দেওয়ালও নেই যে ধরা যাবে। এভাবে উঠতে হবে কম করে ২০-৩০ ফুট। ঠিক হল জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে একে একে সাবধানে ওঠা হবে ৩-৪ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে। সবার আগে নীলাদ্রি, তারপর আমি, শেষে সৌনীপ। একে অপরের ফুটস্টেপ অনুসরণ করে উঠতে শুরু করলাম। জুতোয় জল ঢুকতে শুরু করেছিল। কোনমতে পা বাঁচিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম কোনও বিপদ ছাড়াই।

তালুকা থেকে ট্রেকের শুরু

গাংগর গ্রাম

জানতাম সামনেই ২ কিমির মধ্যেই গাংগর গ্রাম। সেরকম কিছু হলে সেখানেই নাইট-স্টে করতে হবে। একটু এগোতেই গ্রামের সীমা দেখা গেল। কয়েকজন পুরুষ-মহিলা ওই বৃষ্টির মধ্যেই ধাপ-চাষে ব্যস্ত। কী কঠিন এই মানুষগুলোর জীবনযাত্রা। বৃষ্টি আর হাওয়ায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমরা রীতিমতো দৌড়াচ্ছিলাম একটু শেডের আশায়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গ্রামের পাশের রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। বৃষ্টির বেগ কমে এসেছিল। বলবাহাদুর এবং বাকি টিমের কোনও দেখা নেই। বুঝতে পারলাম ওরা এগিয়ে গেছে। আমরাও কয়েক মিনিট রেস্ট নিয়ে জল আর চকলেট খেয়ে রওনা দিলাম। নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়েছিল। ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। চিন্তাও হচ্ছিল। ওকে ধরার জন্য আমরা না থেমে একটানা যতটা জোরে পারি হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর অনেকটা উৎরাই এসে পড়ল। সামনেই জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছিল। সবুজ ঘাসের সমতল রাস্তা পেরিয়ে কিছুটা দূরেই একটা বিশাল পাইন গাছের নীচে নীলাদ্রির মিলিটারি ছোপওলা ছাই রঙের স্যাক আর আমাদের লাগেজ দেখা গেল। ওখানে পৌঁছাতেই দেখি রাস্তা থেকে বাঁ দিকে একটা ছোট্ট ঘাসের মাঠ নেমে গেছে। সেখানেই আমাদের টেন্ট লাগানো হচ্ছে। নদীর আওয়াজে কান পাতা দায়, কিন্তু জায়গাটার অপূর্ব অবস্থান সব ক্লান্তি দূর করে দিল। পাশে সফেন সাদা সুপিন বয়ে চলেছে।'তমসা' আমাদের ছেড়ে গেছে গাংগর-এর অনেক আগেই। সামনে অনেক দূরে পড়ন্ত রোদের আলোয় ঝকঝক করছে হর-কি-দুন পিক। মনে মনে ভাবলাম 'এই তাহলে আমাদের প্রথম জঙ্গল ক্যাম্প'।

আকাশ কালো শ্লেটের মতো হয়ে আছে। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই আবহাওয়ার কী চরম বৈপরীত্য। মাঝে মাঝে কিছু সাদা মেঘ চক দিয়ে যেন আলপনা এঁকে গেছে। টেন্ট লাগানো হতে না হতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। সবাই দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভিজে জামাকাপড় চেঞ্জ করে নিলাম। ঠাণ্ডায় কিছু করার ছিল না। সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে গেলাম। এর মধ্যেই দেখি রনি গরম গরম এলাচ দেওয়া চা দিয়ে গেল। বৃষ্টি কমতেই আশপাশটা ঘুরে দেখার লোভটা সামলানো বড় দায় হল। ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে একটা ট্রেল নেমে গেছে নদীর মাঝে একটা বিশাল বড় চ্যাপ্টা পাথরের দিকে। চারদিকে জলস্রোতের শব্দ। প্রকৃতির কোলে এমন থিয়েটার পেলে কার ফিরে যেতে মন চায়? সামনে অনেক দূরে মেঘ কেটে গিয়ে রোদের খেলা শুরু হয়ে গেছে সাদা তুষার-শৃঙ্গের মাথায়। ওদিকে আবার গরম ম্যাগি খাবার ডাক পড়েছে। যাবার পথে যতটা পারা গেল কাঠ আর পাইনের ফল জোগাড় করে নিলাম তিনজনে।এই ফলগুলোয় প্রচুর আঠালো তরল আছে যেটা ভীষণ ভালো জ্বালানি। আগুনের আলো আর টর্চ ছাড়া কোন আলো নেই। অন্ধকার হতেই বন যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। অদ্ভুত এক সশব্দ নিস্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ধরল। এমন গভীর জঙ্গলে কোনওদিন রাত কাটাইনি। গতবারের মৈনাম শীর্ষের রাত্রিবাস এত গভীর জঙ্গলে ছিল না। আগুনের পাশে বসে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে রনি আর মান সিং-এর বানানো গরম খিচুড়ি আর আলুভাজা খেতে খেতে সঙ্গে বলবাহাদুরের বিভিন্ন এক্সপিডিশনের গল্প একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে উঠল।

টঙ্গ নদী

প্রথম রাতের ক্যাম্প

২৯ এপ্রিল, "চন্দ্রালোকে হর-কি-দুন"

মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছু দিন আসে যেগুলো তার বেঁচে থাকাকে নতুন মানে দিয়ে যায়। সবাই যখন বলে কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে ট্রেকে যাই, চুপ করে থাকি, চোখের সামনে এইসব দিনগুলো ভেসে ওঠে। সব অনুভূতিকে তুচ্ছ করে দিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। সকালের ব্রেকফাস্ট সেরেই আমরা তিনজন আর বলবাহাদুর বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের আজকের গন্তব্য একেবারে হর-কি-দুন ভ্যালি। ওসলা হয়ে ঘুরে যেতে হবে। এদিকটার মধ্যে ওখানেই একমাত্র টেলিফোন বুথ আছে। আগামী তিন-চার দিন বাড়িতে খবর দেওয়া যাবে না। তাই ফোন করার জন্য বাড়তি তিন কিলোমিটার হাঁটার কষ্ট স্বীকার করতেই হত। নীলাদ্রি আগেই পৌঁছে গেছিল। আমি আর সৌনীপ যখন ওসলার সেই ফোনবুথে পৌঁছোলাম নীলাদ্রি বাড়িতে ফোন করে ফেলেছে। আমরাও একে একে সেরে নিলাম। মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে বেশ শান্তি হল। কয়েকটা কচি-কাঁচাকে একগাদা লজেন্স বিলি করে আমরা আবার রওনা দিলাম।

এই যমুনা উপত্যকা, বিশেষ করে ফতে পর্বত অঞ্চলে কৌরবদের উপাসনা করা হত। মজার ব্যাপার এই যে উপাসনার পদ্ধতি ছিল জ্যেষ্ঠ কৌরবের মূর্তিতে পাদুকা ছুঁড়ে মারা। একটু এগোতেই চোখে পড়ল পৃথিবীর একমাত্র দুর্যোধনের মন্দির। পুরোটাই কাঠ আর পাথরের কারুকার্যে ভর্তি। বড় ইচ্ছে ছিল মুর্তিটা দেখার কিন্তু দরজা খোলা না থাকায় বলে দেখতে পেলাম না। শোনা যায় এই অঞ্চলে রাজা ভোগ দত্তেরও একটি মন্দির আছে যিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবদের সাহায্য করেছিলেন। আসার সময় ফেলে আসা নেটওয়ার-এর ওপরের দিকে আছে অঙ্গরাজ কর্ণের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির। যদিও কোনটাই আমাদের দেখা হল না।

ওসলায় দুর্যোধনের মন্দির

চারদিক ঝলমল করছে রোদে। ছবি তোলার সাবজেক্ট প্রচুর অথচ সময় আর ব্যাটারি দুটোই সীমিত। আমার আর সৌনীপের যখন হুঁশ ফিরল তখন আর নীলাদ্রি বা বলবাহাদুর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। একটা বড় ঝরনা পেরোনোর সময় নীচে দূরে সীমা গ্রাম দেখা গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে জলের বোতলগুলো ভরে নেওয়া হল। একটু এগোতেই অনেক দূরে ওদের দেখতে পেলাম একটা সমতল সবুজ ঘাসের ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা পিঁপড়ের মতো লাগছিল নীলাদ্রিকে। সেই সবুজ ময়দানে পৌঁছে দেখি একটু দূরেই সোজা উঠে গেছে পথ। অনেকটা চড়াই পেরিয়ে সামনে একটা ছোট্ট ঝরনার পাশে একটা কাঠের ঝুপড়ি নজরে এল। দেখি বলবাহাদুর বসে গপ্প জুড়েছে একমাত্র দোকানির সঙ্গে। কিন্তু নিলুর (নীলাদ্রির ডাকনাম) কোন পাত্তা নেই। কাছে যেতেই বলবাহাদুর চা করতে বলল। অভিযোগ করতে লাগল নিলুর নামে। "আরে উসকো ম্যাইনে কিতনা টোকা কে ইতনি জলদি মত ভাগো। সামনে ঘনা জঙ্গল হে, ভালু ভি হে, রস্তা খো সকতা হে, শুনা নহি"। আমাদের চিন্তা হতে লাগল। তবে মনে মনে ভাবলাম ও আমাদের প্রোটোকল জানে, নিশ্চয়ই কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। খুব খিদে পাচ্ছিল। সৌনীপ আর আমি ম্যাগি খেয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে টিমের বাকিরা এসে পড়ায় তারাও চা খাওয়ার জন্য বসল। আমি, সৌনীপ আর বাহাদুরজি এগোতে শুরু করলাম। সামনে ঊর্ধ্বশ্বাস চড়াই। কিছুটা এগোতেই দেখলাম নিলু একটা পাথরের ধাপে বসে আছে। নিশ্চিন্ত হলাম। দূরে Trek The Himalaya-র নীল তাঁবুর ক্যাম্প চোখে পড়ল।

স্বর্গারোহিণী শৃঙ্গ

মিনিট পঁয়তাল্লিশ একটানা হাঁটার পর একটা সমতল এলাকা চোখে পড়ল। সবুজ ঘাসে ভর্তি সেই মাঠে সোনা রোদে পিঠ এলিয়ে দিলাম সবাই। আমাদের পোর্টাররা ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত। সামনে অন্তহীন চড়াই যেটার চোখে দেখা সীমানা শেষ হয়েছে অনেক দূরে পাহাড়ের বাঁকে। বলবাহাদুর বলল এখনও ঘন্টা তিনেক লাগবে ক্যাম্পিং সাইটে পৌঁছোতে। ১০-১৫ মিনিট বসে আবার চড়াই শুরু হল। আমাদের সঙ্গীরা ওদের সঙ্গে থাকা রুটি আর ছোলার তরকারি খেয়ে লম্বা পায়ে প্রায় ছুট দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই লোকগুলোর বুঝি চার-পাঁচটা ফুসফুস, দমে এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব।

পশ্চিমের আকাশ কালো করে আসছে দূরে। সংকেত ভালো নয় বুঝে আমরাও যথাসাধ্য জোরে হাঁটছি। এক বিষম ঢালু উৎরাই নেমে বাঁক ঘুরতেই চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল তিনজনের। সামনে এক বিশাল গ্লেসিয়ার নেমে গেছে অন্তত ২০০০ ফুট খাদে। ঝুরো বরফ নয়, এ হল শক্ত আইস। পেরোতে হবে প্রায় ৫০ মিটার পথ। আগে লোকজন যাওয়াতে একটা ট্রেল হয়ে আছে ঠিকই কিন্তু তাতে ধুলো-কাদা মেখে পথ আরও পিচ্ছিল। আমাদের হাঁটার স্টিক ছিল না। ঠিক হল একে একে পেরোনো হবে। সবার প্রথমে সৌনীপ পেরিয়ে গেল আর নিলু ভিডিওতে ধরে রাখল সেটা। এরপর আমার পালা। একটা ছোটো ডাল ভেঙে নিলাম যাতে স্লিপ করলে অ্যাংকর করতে পারি। গোড়ালি ঠুকে ঠুকে গ্রিপ বানিয়ে এগোতে থাকলাম। কোন অসুবিধে হল না। নীলাদ্রিও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এল। দু'পা হাঁটতেই দেখি অসুবিধে হচ্ছে। জুতোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল। সোলের অর্ধেক খুলে গেছে। ফেভিকুইক সঙ্গে থাকলেও সেটা রাখা রুকস্যাকে, যেটা আবার পোর্টাররা নিয়ে দৌড়েছে। এবারের রাস্তা যেন

গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে

ভালো হয় এই প্রার্থনা করতে করতে কোনওমতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এগোতে লাগলাম।একটু পরেই রাস্তা প্রায় সমতল হয়ে এল। সবুজ বুগিয়াল, বরফের চাদর আর কাঁটাঝোপের খপ্পর এড়িয়ে এগোতে থাকলাম তিনমূর্তি।
যখন পা আর চলছে না, বৃষ্টি প্রায় ধরে ফেলব ফেলব করছে কিছুটা দূরেই আমাদের তাঁবু দেখা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শেষ ১০০ মিটার কোনক্রমে পা টেনে টেনে তাঁবুতে ঢুকলাম। রনি ততক্ষণে এলাচ দেওয়া গরম চা নিয়ে হাজির। চা খেয়ে মিনিট দশেক বসতেই বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। এমন গোল গোল পুঁতির মতো বরফপাত আমার জীবনে প্রথম। তাঁবু ফাঁক করে দেখলাম। বেশিক্ষণ পারা গেল না, ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের ক্যাম্প ৩৫০০ মিটার উচ্চতায়, কিছুটা হলেও হাই অল্টিটিউডের ক্লান্তি শরীরকে চেপে ধরছিল। তাঁবুর ভিতর স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, আর কিলোমিটার খানেক দূরেই সেই অপরূপ উপত্যকা, যার জন্য এতদূর থেকে আসা।
ঘন্টা খানেক তুষারপাত চলার পর যখন থামল বাইরের প্রকৃতির অনেক বদল ঘটে গেছে। সবুজ সমতল ময়দান প্রায় পুরোটাই ঢেকে গেছে বরফে। ভীষণ ঠাণ্ডা একটা উত্তুরে হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে যেটুকু কাঠ পাওয়া যায় আমি রনি আর তেজ বাহাদুর তা দিয়েই আগুন জ্বালাতে শুরু করে দিলাম। মান সিং চা বানাচ্ছিল আর বাকিরা গেছিল সামনের জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে আনতে।

চাঁদনি রাতে স্বর্গারোহিণী

সন্ধে নেমে গেছে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। দেখে বোঝার উপায় নেই একটু আগে এত কিছু হয়ে গেল। শরীরের যে দিকটা আগুনের সামনে ছিল সেদিকটা গরম হচ্ছিল আর উল্টোদিকটা ঠাণ্ডা। রুটি সেঁকার মতো নিজেদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আগুনে সেঁকে নিচ্ছিলাম। একটু পরেই একাদশীর চাঁদ দেখা দিল স্বর্গারোহিণী পিক-এর পিছন থেকে। চার দিন পরেই বুদ্ধ পূর্ণিমা। দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার রাজ্যে সে এক অলীক অকল্পনীয় বাক্যহীন করে দেওয়া দৃশ্য। চারিদিকে গগনচুম্বী গিরিশীর্ষের মাথায় গলন্ত জ্যোৎস্না এক নীলাভ-রূপোলি আলোয় চারিদিক ভরিয়ে তুলেছে। সৌনীপ ছুটল ওর ট্রাইপড নিয়ে ছবি তুলতে। মৈনাম-এর স্মৃতি মাথায় ঘুরছিল। কিন্তু এখানকার শোভা আরও জীবন্ত, আরও হাতের নাগালে, আরও বিস্তৃত, আরও হৃদয় স্তব্ধ করে দেওয়া। এই অসীম নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে এই সীমাহীন একাকিত্ব মনের সমস্ত উৎকণ্ঠাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। শুধু এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসছিল বনবিড়ালের ফ্যাঁসফেঁসে ডাক। বল বাহাদুর চেঁচিয়ে আমাদের আগুনের কাছে আসতে বলল। রুইনসারা যাওয়া হবে কিনা সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এবারে তুষারপাতের পরিমাণ অনেক বেশি। আজও হল। আমরা একটা দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। পরে ভেবে ঠিক করব এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আগুনের আলোয় গোল করে বসে ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ আর পিঁয়াজ সহযোগে ডিনার সেরে ৯.৩০ নাগাদ স্লিপিং ব্যাগের তলায় আশ্রয় নিলাম। মনে হল যদি আমার কোনও প্রেমিকা থাকত আর তাকে এই চন্দ্রোদয় দেখাতে পারতাম! হয়তো পথ হাঁটার ক্লান্তিই প্রেমিকার হয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দেরি করল না।

৩০ এপ্রিল, "মহাপ্রস্থানের পথে"...

ঘুম ভাঙল ভোর সাড়ে পাঁচটায়। আজ অনেকটা হাঁটা আছে। প্রথমে হর-কি-দুন দেখে ক্যাম্পে ফেরা আর তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে যতটা পারা যায় নেমে চলা। চা খেয়ে সকালের কাজকর্ম সেরে নিলাম জলদি জলদি। অনুভব করলাম শরীরের খোলা অংশে ঠাণ্ডা যেন কামড় বসাচ্ছে শ্বদন্ত বের করে। আজ আমরা হাঁটব সেই স্বর্গারোহিণীর পথে। এই পথেই একে একে দেহত্যাগ করেন চার পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী। আর একটি স্বর্গারোহিণী পিক আছে সতোপন্থ তাল এর পথে। কোন পথ যে সেই মহাভারতের যুগের যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সিঁড়ি, জানা নেই। আমরা তিনজন, বলবাহাদুর আর রনি বেরিয়ে পড়লাম হর-কি-দুন উপত্যকার উদ্দ্যেশ্যে। যাত্রা শুরু হল ব্রেকফাস্টে সিমুই-এর পায়েস দিয়ে মিষ্টিমুখ করে।
এই পুরো উপত্যকা গোবিন্দ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৫৫ সালে এর সূচনা হয় এক অভয়ারণ্য হিসেবে এবং নামকরণ করা হয় উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এর নামে। ৯৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়ানো এই অরণ্যের বিস্তৃতি নেতওয়াড় (১৪৩৯ মি) থেকে বন্দরপূচ্ছ শিখর (৬৩২৫ মি) পর্যন্ত। সবুজ তৃণভূমি (বুগিয়াল), পাইন, ওক, দেওদার, ব্লুপাইন, সিলভার বার্চ, রডোডেন্ড্রন, ভূর্জপত্র ইত্যাদির গভীর জঙ্গল, তুষারশুভ্র শিখর, হিমালয়ের কালো এবং বাদামি ভালুক, তুষারচিতা, বনবিড়াল, ভারাল, হরিণ এবং আরও অনেক পশু-পক্ষীর আবাসস্থল এই বনভূমিকে ন্যাশানাল পার্ক এর মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৯০ সালে।

রাত্রে পড়া তুষারে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ওদিকে সকালের সূর্য আমাদের গায়ে এক উষ্ণতার চাদর চাপিয়ে দিচ্ছিল। প্রায় এক কিমি মতো চলার পর দেখলাম সুপিন-এর অববাহিকায় সুন্দর এক ফাঁকা ময়দানের মতো ক্যাম্পসাইটে এক স্বনামধন্য ট্রেকিং গ্রুপের রঙিন সিঙ্গল ডোমটেন্ট-এর সারি। সাদা ময়দানে একটুকরো রামধনুর মতো ছবি এঁকে গেছে তাঁবুগুলো। আমরা ওদের সামনে যেতেই এক ভদ্রলোক (সম্ভবত ট্রেক লিডার) বেশ দম্ভ এবং তাচ্ছিল্যভরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কারা, কোন জায়গা থেকে আসছি, কোন ট্রেকিং টিমের সঙ্গে, বরফে হাঁটার স্টিক আনিনি কেন, কেন এত ওভারকনফিডেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন করার ভঙ্গিমায় অদ্ভুত এক তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছিল। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করলেন। মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল। আমরা অর্ধেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই এগিয়ে গেলাম।

সুপিন নদী

সুপিন নদীর পাশে পাশে মিনিট দশেক হাঁটার পরেই সামনে তার তুষার রাজ্যের মনোমুগ্ধকর শুভ্রতা নিয়ে হাজির হল সেই স্বর্গীয় উপত্যকা। সব রাগ-দুঃখ-মান-অভিমান-কষ্ট এক লহমায় উধাও হয়ে গিয়ে এক অপরিসীম নিশ্চুপ আহ্লাদি শান্তি মনকে স্তব্ধ করে দিল। সামনে এক অপার বিস্ময় নিয়ে হিমালয় তার বুক পেতে অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য। বরফের মধ্যে পা ডুবিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের গন্তব্যের দিকে।

আইস অ্যাক্স গেঁথে উপরে ওঠা

৩০ এপ্রিল, "মহাপ্রস্থানের পথে"...যমদ্বারে...

সাদার রাজ্যে এক টুকরো রঙিন প্রজাপতির মতো সবুজ ছাদ আর হলুদ দেওয়ালের ফরেস্ট বাংলো একা দাঁড়িয়ে। সামনে যেন হাতের নাগালে স্বর্গারোহিণী, বন্দরপুচ্ছ, কালা পর্বত, হর-কি-দুন। নীচে বয়ে চলেছে সুপিন নদী আর তার পাশ দিয়ে দূর দিগন্তে মিশে গেছে যমদ্বার গ্লেসিয়ার। আমাদের ইচ্ছে ছিল ঘুরে আসার। কিন্তু ওই গভীর বরফাবৃত নির্জন প্রান্তরে পা রাখার সাহস হল না। সামনে এক উঁচু টিলা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তার ওপরে জমে রাজ্যের বরফ। আইস অ্যাক্স দিয়ে রনি স্টেপ কাটার চেষ্টা করছিল, না পেরে কোনওমতে হাত-পা সব লাগিয়ে একগাদা বরফ মেখে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। ওর এটাই প্রথম স্নো-ক্লাইম্বিং, আমাদেরও। একটু উঠেই বেচারা হড়কে নেমে গেল। এরপর আমি আইস অ্যাক্সটা নিয়ে ইউ-টিউবে দেখা ক্লাইম্বিং ভিডিওগুলোর জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্টেপ বানিয়ে উঠে পড়লাম আস্তে আস্তে। উচ্চতা বেশি ছিল না, বড়জোর ৩০ ফুট হবে, অসুবিধে হল না। একে একে সবাই উঠে এল। অবাক বিস্ময়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যে । William Wordsworth এর "Yarrow Visited" এর একটা স্তবক এখানে হয়তো কবিতার অভাব পূর্ণ করে দেবে-

"Yet why?
– a silvery current flows
With uncontrolled meanderings;
Nor have these eyes by greener hills
Been soothed, in all my wanderings.
And, through her depths, Saint Mary's Lake
Is visibly delighted;
For not a feature of those hills
Is in the mirror slighted."

অনেকক্ষণ ওখানে কাটালাম আমরা, অনেক ছবি তোলা হল। নেমে যেতে কারোরই বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রোজকার মতো আজকের আকাশও আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য মুখ ভার করতে শুরু করেছিল। আর সময় দিতে না পারার মন খারাপ সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে তুষাররাজ্যকে বিদায় জানাতে হল। ক্যাম্পে ফিরে এলাম ১০টা নাগাদ। লাঞ্চ তৈরি ছিল। আলুর তরকারি, ডাল আর ভাত গরম গরম খেয়ে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে স্যাক গুছিয়ে আমরা তিনজন আর বাহাদুরজি বেরিয়ে পড়লাম। বাকিরাও টেন্ট গুটিয়ে পিছনে আসার জন্য তৈরি হতে লাগল। আজ আমাদের গন্তব্য আগের দিনের দেখা ট্রেক দি হিমালয় এর ক্যাম্পসাইট-২। আমরা রুইনসারা লেক যাচ্ছি না এটা কাল রাতেই ঠিক করা হয়ে গেছিল। রাস্তার অবস্থা ভালো নয় এবং তার সঙ্গে হওয়া অতিরিক্ত তুষারপাত শেষ কয়েক কিলোমিটারের রাস্তা ভীষণ কঠিন করে দিয়েছে। তাছাড়া ভূমিকম্পের পর বাড়িতেও চিন্তা বেড়ে যাওয়ায় আমরা ট্রেক শর্ট করে দেওয়ায় একমত হলাম।

রাস্তা চেনা, তাই আর দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে বাধা নেই। আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে আসছিল। হাওয়াতেও হাল্কা কাঁপুনি টের পাওয়া যেতে লাগল বেলা বাড়তেই। ঘন্টা তিনেক এক নাগাড়ে হাঁটার পর আমরা যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি, ভিজিবিলিটি খুব কমে এল। নীলাদ্রি জোরে হেঁটে আমাদের গাইডদের সঙ্গে ক্যাম্পে পৌঁছে গেছিল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। মাটির রাস্তা কাদা কাদা আর পিচ্ছিল হয়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে সৌনীপ আর আমি দুজনেই বারকয়েক পিছলে গেলাম। দূরে কেদারকণ্ঠ পিক এর মাথায় স্নো-ফল দেখা যাচ্ছিল। টেন্ট-এ ঢোকার দশ পনের মিনিটের মধ্যেই ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি আর তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডায় স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তিনজনে গায়ে গায়ে সেঁটে বসলাম। কিচেন টেন্ট পাশেই ছিল। কোনওমতে চেন খুলে রনি গরম এলাচ দেওয়া চা সাপ্লাই দিতে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এক ফাঁকে টেন্টের চেন অল্প ফাঁক করে দেখতে পেলাম বাইরে পুরো হোয়াইট-আউট, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না।

গ্লেসিয়ারের উপরে

হর কি দুন উপত্যকায় ক্যাম্প সাইট

ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাত ঘণ্টা খানেক চলল। থামল যখন প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। সবুজ ময়দানের ওপর সাদার ছোপ পড়েছে। শেষ বিকেলের রোদে জুতো খুলে পাথরের ওপর বসলাম আমরা তিনজন আর বাহাদুরজি। নীচের বন থেকে শুকনো কাঠ এনে জড়ো করেছে রনি আর তেজ বাহাদুর। মান সিং গরম ম্যাগি আর কফি দিয়ে গেল। দূরে কেদারকণ্ঠের মাথায় আর-এক পশলা ধবধবে সাদা বরফের প্রলেপ পড়েছে। বাহাদুরজি বললেন যে তাঁর প্রিয় ক্লায়েন্ট সবসময় বাঙালিরা। ওঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পর্বতারোহণ জীবনের ফেভারিট বাঙালিদের অনেক গল্প শোনালেন। তার মধ্যে ওঁর প্রিয় বন্ধু সোনারপুরের কালীবাবুর সঙ্গে ব্ল্যাক পিক অভিযানে গিয়ে তাঁর বাঁ পায়ে হওয়া ফ্রস্ট বাইটের গল্প এবং তারপর প্লাস্টিক সার্জারির দাগ দেখে সত্যিই মনে শ্রদ্ধা জাগল এই প্রবীণ গ্রাম্য মানুষটার প্রতি।

শেষ বিকেলের তুলোমোছা গোলাপি আলো নিভে যেতেই হই-হই করে ছুটে এল পাগল ঠাণ্ডা হাওয়া। আগুনের পাশে গোল করে দাঁড়িয়ে আড্ডা চলল বেশ কিছুক্ষণ। রনি বলল ও মুম্বাইয়ে তাজ হোটেলের বয়-এর কাজ করত। মিথ্যে অভিযোগে ওর চাকরি চলে যায়। তারপর ফিরে আসে নিজের গ্রামে আর বাহাদুরজি'র দলে ভিড়ে যায়। রোগা লম্বা রনিকে দেখলে বোঝা যায় না ওর শরীরে কী শক্তি এবং টেনাসিটি। শহরপ্রিয় আধুনিক তরুণের বন পাহাড় আর জঙ্গুলে জীবনযাপনের এ এক অন্য সংঘর্ষের মনখারাপ করা গল্প। রনি রুটি বানাতে চলে যাওয়ার পর আমরাও তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। স্লিপিং ব্যাগে আধশোয়া হয়ে গল্প চলতে থাকল। রুটি আর আলু-টম্যাটোর তরকারি দিয়ে উপাদেয় ডিনার সারার পর তিনজনে একটু হাঁটতে বেরোলাম। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। বাসন ধুতে ধুতে মান সিং বলল "আজ কি রাত ভয়ানক হোগি, তুফান আয়েগা।" কী করে বুঝলেন জানতে চাওয়ায় শুধু আলতো হেসে বলল, "পতা হে"।

বরফে মোড়া হর কি দুন উপত্যকা

রাত তখন প্রায় সাড়ে ৯টা বাজে, প্রচন্ড বিদ্যুতের ঝলকানি আর বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। বাইরে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ায় তাঁবু থরথর করে কাঁপছে, আর তার ভিতরে আমরা। বৃষ্টি আর বরফ একসঙ্গে ঝাপ্টা মারছে তাঁবুর আউটার লাইনিং-এ। নীলাদ্রি জেগে, পাশ থেকে বলল "মনে হয় আজ আমরা গেলাম মায়ের ভোগে। তাঁবু উড়ে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না"। এদিকে যে ছেলে রোজ রাতে একটা-দুটোর সময় উঠে বলছিল বাইরে ছবি তুলতে যাবে, তার কোন বিকার নেই। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে সৌনীপ। আমরা মনে মনে ইষ্টনাম জপতে লাগলাম। এদিকে হাওয়ার বেগ বাড়ছে। ঘোর অনিচ্ছেতেও আমি আর নীলাদ্রি উঠে আমাদের যত ভারি জিনিস, রুকস্যাক এসব দিয়ে তাঁবুর ধারে ধারে দিয়ে দিলাম যাতে একটু হলেও সাপোর্ট পাওয়া যায়। হঠাৎ শুনি বাইরে থেকে মান সিং আর রনির আওয়াজ, "আপলোগ ঠিক হে না

সাব"? ধন্য এদের কর্তব্য পরায়ণতা। এই হাড় জমিয়ে দেওয়া তুষার ঝড়ের মাঝখানেও ওরা আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। বাইরে বেরিয়ে তাঁবুর অ্যাংকর ঠিক করে দিচ্ছে যাতে তাঁবু উড়ে না যায়। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় চোখ ভিজে এল। এই স্বল্প-চেনা মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

১ মার্চ, "এই পথ যদি না শেষ হয়"...

যখন ঘুম ভাঙল আকাশ জাগতে শুরু করেছে। জুতো পরতে গিয়ে দেখি ফিতেগুলো ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে। যে জল-কাদা মাখা রাস্তা দিয়ে কাল নেমেছি আজ সেটা সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা। আশেপাশের সব চূড়া পুরোপুরি বরফাবৃত। আজ প্রায় ২০ কিমি ট্রেক আছে। এখান থেকে সীমা হয়ে প্রথম দিনের ক্যাম্প পেরিয়ে একেবারে সোজা তালুকা। পুরো রাস্তাটা একবার চোখ বুজে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। নাঃ, এতটা হাঁটা কি সম্ভব একদিনে? তারপর আবার সম্ভব হলে গাড়িতে ফিরতে হবে মোরি অবধি। দেখা যাক। সকালের কাজকর্ম সেরে আগে সৌনীপের ডিরেকশন অনুযায়ী গ্রুপ ফোটোসেশন খতম করে ফেলা হল। তারপর পরোটা আর ছোলার তরকারি দিয়ে জলযোগ সেরে ঠিক ৬.৩৫-এ হাঁটা শুরু হল।

ফোটোসেশন

আজ শুরু থেকেই ঠিক ছিল পা চালাতে হবে যতটা সম্ভব। নামার সময় চলার গতি এমনিই একটু বেশি থাকে, আর কষ্টটাও তুলনামুলক ভাবে কম হয়। ঘন্টা দুয়েক একটানা হাঁটার পর দূরে সীমা গ্রামের ব্রিজ দেখা গেল। বাহাদুরজি ওখানেই একটা পাথরের ওপর বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সেটা ওসলা হয়ে। বাঁ দিকে একটা রাস্তা খাড়াই নেমে গেছে সীমা ব্রিজের দিকে। আমাদের গন্তব্য ওই দিকেই। সময় বাঁচাতে হবে। বাহাদুরজি রাস্তা দেখিয়েই হাঁটা লাগালেন এই বলে যে এখনও অনেক পথ বাকি, জলদি হাঁটুন। আমাদের তখন তেষ্টায় গলা কাঠ। পাশের ঝরনা থেকে জল ভরে জিওলিন মিশিয়ে নেওয়া হল আর যেটুকু জল ছিল সেটুকু ঢকঢক করে খেয়ে ফেলা হল।

এরপর সেই একই পথে নেমে চলা বিরামহীন। মাঝখানে এক ফাঁকা ময়দানের মতো চত্তরে বসে সকালের বানানো রুটি আর ছোলাসেদ্ধ দিয়ে লাঞ্চ সারা আর আবার জুতোর সোল খুলে যাওয়া ছাড়া বলার মতো কোন ঘটনা ঘটল না। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে আড়াইটে নাগাদ পৌঁছোলাম তালুকা। গ্রামের এক অত্যুৎসাহী ভদ্রলোক জানালেন এই মাত্র সাঁকরি যাওয়ার শেষ জিপ বেরিয়ে গেল। আমাদের নাকি উনি আসতে দেখেছিলেন, কিন্তু আমরা ফিরব কিনা জানতেন না বলে জিপটাকে আটকাননি। এটা জেনে আমার মাথা রাগে জ্বলতে শুরু করল। কি আর করা অপেক্ষা ছাড়া। এদিকে আমরা আসার সময় যে লজটায় ছিলাম সেটা এবং GMVN গেস্ট হাউস দুটোই ভর্তি, থাকার কোন জায়গা নেই। সাঁকরি হয়ে মোরি আমাদের পৌঁছোতেই হবে নাহলে রাতে তাঁবু খাটিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্য ভালো তিনটে নাগাদ একটা জিপ এল সাঁকরি থেকে। সে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে আমাদের সবাইকে মোরি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি হল। অগত্যা তাতেই সায় দিতে হল। পাঁচটা নাগাদ মোরি পৌঁছে গেলাম। বাহাদুরজি বললেন হাতে সময় আছে। আমরা পুরোলা ফেরার চেষ্টা করে দেখতে পারি। মোরি জায়গাটা একেবারেই আধা-মফস্বল টাইপ। খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না। রাজি হয়ে গেলাম। একটা শেয়ার জিপ পাওয়া গেল। অনেক কষ্টে চাপাচাপি করে বসে সাড়ে সাতটা নাগাদ পুরোলা এসে পড়লাম। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আর কিছু বাকি ছিল না। ভাল হোটেলের নরম বিছানায় শুয়ে দিব্যি ঘুম হল। এরপর ফিরে চলা হরিদ্বার হয়ে প্রিয় শহর কলকাতায়। নেপাল-সিকিম-উত্তরাখণ্ড পাড়ি জমিয়ে এরপর কোনদিকে? সেটার সিক্রেটটা নাহয় পরেরবারের জন্য তোলা থাক।

[পুনশ্চঃ সমস্ত তথ্য উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন ব্লগ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত। সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সমস্ত ছবি আমাদের নিজেদের তোলা এবং "পদাতিক" গ্রুপের তরফ থেকে দেওয়া - সৌজন্যে সুদীপ, নিলাদ্রি, সৌনীপ এবং অভিষেক।]

যমদ্বার গ্লেসিয়ার

~ ~ হর কি দুন ট্রেক রুট ম্যাপ ~ হর কি দুন ট্রেকের আরও ছবি ~

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় মুখ্যালয়ে জুনিয়ার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেমিক্যাল) পদে কর্মরত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রসায়নে স্নাতক এবং এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড সয়েল সায়েন্স-এ স্নাতোকোত্তর । কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। পাহাড় পাগল, হিমালয় প্রেমী। "পদাতিক" নামক চার জনের ছোট্ট ট্রেকিং দলের সদস্য। "বছরে একটা ট্রেক-এ না গেলে বছরটাই মাটি" তত্ত্বে বিশ্বাসী। ভ্রমনকাহিনি ছাড়াও কবিতা লেখা ও পড়া নেশা। অল্প-বিস্তর ছবি আঁকা আর ছবি তোলা প্যাশন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

হঠাৎ দেখা ভোজপুর

অতীন চক্রবর্তী

ভ্রমণ পিপাসু মানুষ নেশার টানে ছুটে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে - 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে...' কারোর সঙ্গে রয়েছে ভ্রমণসূচী - বাঁধাধরা আকর্ষণীয় নানা ট্যুরিস্ট স্পটের বিবরণ বা বিভিন্ন ভ্রমণার্থীদের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এর বাইরেও আনাচে-কানাচে রয়েছে কত গোপন রত্নভান্ডার - যা বেশিরভাগ ভ্রমণ তালিকায় উপেক্ষিত। তেমন কিছুর সন্ধান পেলে কত অজানাকেই না জানা হয়ে যায়।

দৈবক্রমে এই রকম এক লুকোনো সম্পদের খোঁজ পেয়েছিলাম আমরা ডঃ গিরিজা প্রসাদের কাছ থেকে। ভূপালের সেই বিখ্যাত আপার লেকে আলাপ হয়েছিল ডঃ প্রসাদের সঙ্গে। পেশায় তিনি একজন আর্কিওলজিস্ট। কাজের জন্য প্রায়ই তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। মধ্যপ্রদেশের উপেক্ষিত অনেক লুপ্ত প্রাচীন শিল্পকলা-স্থাপত্যবিদ্যা-সভ্যতার খোঁজে সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে বেড়ান বিভিন্ন ভগ্ন ধ্বংসস্তূপে। বেতোয়া নদীর দক্ষিণ কূলকে কেন্দ্র করে আশেপাশের অনেকটা অঞ্চলের নতুন কিছু প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করবার আশায় এদিকে আবার এসেছেন। এই বেতোয়া এককালে বৈত্রাবতী নামে পরিচিত ছিল। এইখানেই একসময়ে পরমারা বংশের রাজা ভোজ গড়ে তুলেছিলেন ভোজপুর শহরটি। এইসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি ট্যুরিস্ট, এদিকে বেড়াতে এসেছেন? কোন কোন জায়গায় ঘুরলেন?"

উত্তরে জানাই, "ঠিক ট্যুরিস্ট না, সেমি-ট্যুরিস্ট বলতে পারেন। আমার কোম্পানির একটা কাজ কয়েকমাস ধরে এখানে চলছিল। আজই শেষ হল। তবে তারই ফাঁকে ফাঁকে দুজনে ঘুরে এসেছি ভীমবেটকা,পঞ্চমারী, ইন্দোর, উজ্জৈন - এইসব।"

"অথচ এখান থেকে এত কাছের ভোজপুরের কথা আপনাদের একবারও মনে পড়েনি? এই যে আমরা ভূপালের আপার লেকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি,এর থেকে মাত্র ৩০ কিমি দূরে এককালে গড়ে উঠেছিল ভোজপুর শহর। পরমারা বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজা ভোজ। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ভোজ ছিলেন সাহিত্য, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। এই লেকটা ছিল সেই সময় তাঁরই অতুলনীয় অবদান। তখন থেকেই এটা ভূপালের সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। সেই ১১শ শতকেই ভোজ রাজা ভোজপুর শহরকে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য অনুরূপ একটি ৪০০ স্কোয়ার কিলোমিটার লেক গড়ে তুলেছিলেন সেখানে। নাম ভীমতাল। দুপাশের দুটো প্রকৃতির অবদান পাহাড়কে ব্যবহার করেছিলেন ন্যাচারাল ওয়াল হিসাবে। আর এদের মাঝে যে অংশটুকু ফাঁকা পড়েছিল তাকেই ড্যাম বানাবার উপযুক্ত অংশ হিসাবে নিয়েছিলেন। ছোট আর বড় ফাঁকা অংশটুকু যথাক্রমে ১০০ ও ৫০০ গজের মতো চওড়া হিসাবে পেয়েছিলেন। মাটির বাঁধ বানিয়ে বেলেপাথরের বড় বড় ব্লক দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল একে। এই প্রাচীন ড্যাম সম্বন্ধে জানা যায় - এই Cyclopean Dam এ কোন মর্টার ব্যবহার করা হয় নি। ১০০ গজের ফাঁকটা বন্ধ করতে ২৪ ফুট উঁচু আর ১০০ ফুট চওড়া বাঁধ বানানো হয়েছিল আর ৫০০ গজের বড় অংশটার জন্য ৪৪ ফুট উঁচু আর ৩০০ ফুট চওড়া বাঁধ, এখন থেকে হাজার বছর আহে এই রকম একটি প্রকাণ্ড আকৃতির ড্যামের কনস্ট্রাকশন সত্যি অভাবনীয়। আর তারই পাশে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন বিশ্বের উচ্চতম এক শিবলিঙ্গের মন্দির, - ভোজেশ্বর মন্দির, যাকে বলা হয় সোমনাথের আরেকটি "নামমালা" বা পরিভাষা। যদিও গর্ভগৃহের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল,তবু ১১শ-১৩শ শতাব্দীর মন্দির স্থাপত্যের এও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিজে না দেখলে এ শিল্পের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এই ড্যাম আর মন্দিরের প্রধান অবদান যে ভোজরাজার,তিনি যে সত্যিই শিল্প, স্থাপত্য আর শিক্ষার প্যাট্রন ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা কাল ওদিকেই যাব, যদি সকাল সকাল রেডি হতে পারেন তবে আমাদের সাথে যেতে পারেন।"

"এ সুযোগ কি হাত ছাড়া করা যায় বলুন! আচ্ছা, ড্যাম বানাবার কারণ না হয় বোঝা যায়, কিন্তু রাজা ভোজ নগর থেকে দূরে হঠাৎ এই ভোজপুরের মতো অতি সাধারণ নাম না-জানা গ্রামে এত বড় শিব মন্দির বানাবার কি যুক্তি পেয়েছিলেন? এখানে কি আগেই কোনও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?" - আমার গিন্নি ডঃ প্রসাদের কাছে জানতে চান।

"প্রাচীন যত দেবদেবীর মন্দির পাবেন, দেখবেন তাদের বেশিরভাগের সাথেই কোনও না কোনও কাহিনি-গল্প-গাঁথা জুড়ে থাকেই। হয়তো কোনও স্বপ্নাদেশ বা কোনও অলৌকিক কাহিনি এই রকম কিছু না কিছু ঘটনা জড়িয়ে থাকে এইসব মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। তার সত্যি-মিথ্যার বিচার নিয়ে ভক্তরা কতোটুকুবা মাথা ঘামায়? আসলে কী জানেন ভক্তের ভক্তি-বিশ্বাসই প্রাধান্য পায়, যুক্তি-তর্ক তোলা থাকে ঐতিহাসিক বা গবেষকদের জন্য। এইরকমই ভোজপুরের স্থানীয় গল্প-গাঁথায় বলা হয়, রাজা ভোজের ভোজেশ্বর মন্দির স্থাপনের অনেক আগেই এখানে নাকি একটি শিব মন্দির ছিল যা পান্ডবেরা আত্মগোপনের সময় এসে বানিয়েছিলেন। অবশ্য এই রকম এক বিরাট জলাশয়কে পাশে রেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা শান্ত পরিবেশে যে বিশাল মন্দিরটি ভোজ রাজা গড়তে চেয়েছিলেন তা নিশ্চয় প্রশংসার দাবি রাখে। কালকে ওখানে গেলে তা আপনারাও অনুভব করবেন। এবার চলুন হোটেলে ফেরা যাক, আমাকে একটু কালকের কাজের প্রস্তুতি নিতে হবে।"

ডঃ প্রসাদের মুখে এত শোনার পর আমাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল ভোজেশ্বর মন্দির আর ড্যামটা দেখবার জন্য। এক দিকে ধর্ম, অপর দিকে ড্যাম আর মন্দিরের শিল্প-স্থাপত্যের আকর্ষণ। এ ছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্যের হাতছানি। পরের দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম ওঁদের সঙ্গে। টাটা সুমো ছুটে চলল ঘিঞ্জি শহর পেরিয়ে। যেতে যেতে এক সময় রাস্তার এক ধারে দেখে নেওয়া শ্রী মহাগণেশজী মন্দির। এরপর আবার গাড়ি ছুটে চলল ন্যাশন্যাল হাইওয়ে-১২র ওপর দিয়ে। কোলাহলমুখরিত শহরের বাইরে এসে পেয়ে গেলাম প্রকৃতির দান রম্যাণী দৃশ্যাবলী। ভোরের আলোতে আকাশ-বনরেখা-পাহাড় সব মিলে এনে দিয়েছিল এক চোখভরা-মনছোঁয়া আনন্দের খোরাক।

"আমরা কি প্রথমে ড্যাম দেখতে যাব, না কি মন্দির আগে দেখব?" - জানতে চাইলাম ডঃ প্রসাদের কাছে।

"সবই তো পাশাপাশি। তবে কি জানেন সেই অপূর্ব ড্যাম তো আজকাল আর আগের মতো নেই। হোসেন শার আদেশে এই ড্যামকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। প্রচলিত কাহিনিতে জানা যায় এর জল খালি করতে তিন মাস সময় নিয়েছিল। তবে যেটুকু দেখতে পাবেন তাতেই ভোজ রাজের

প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা এসে যাবে। আমি কিন্তু পুরো সময় আপনাদের দিতে পারব না। আপনাদের নামিয়ে আমি আমার কাজের জায়গায় চলে যাব, বিকেলে আবার আসব আপনাদের তুলে নিতে। তবে যাবার আগে এই মন্দির তৈরি করার কাজ আরম্ভ করবার আগে এরা যে পুরো একটা মাস্টার প্ল্যান রকের ওপর নকশা খোদাই করে নিয়ে কাজে নেমেছিল সেটা দেখাতে নিয়ে যাব। এতে দেখতে পাবেন মন্দির বানাবার ডিটেলস ড্রয়িং,যা আধুনিক যুগের যে কোনও Erection Commission-এর মাস্টার প্ল্যানের সাথে তুলনীয়। এতে রয়েছে টেকনিক্যাল প্ল্যান, এলিভেশন ভিউ যাতে দেখতে পাবেন মন্দিরের প্রতিটি বিগ্রহ, স্তম্ভ, গম্বুজ, খিলান, যোণিপট্টসহ বৃহৎ শিবলিঙ্গের অবস্থানের প্রকৃত দিশা। এখন অবশ্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে বাকি খোদাই করা রকটা রেলিং দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, যাতে এর উপর দিয়ে লোকেরা আর চলা ফেরা না করতে পারে।"

"অবাক হয়ে গেলাম আপনার এই কথা শুনে, - ১০-১১শ শতাব্দিতেও কত সিস্টেমেটিক ছিল ভারতের টেকনিক্যাল টিম!"

গল্পে গল্পে কখন যে ভোজপুর রোডে গাড়ি উঠে পরেছিল খেয়াল করিনি। গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ নজরে এল দূরে ঢেউ-খেলানো ছোট্ট পাহাড়, যার ওপরে দেখা যাচ্ছে একটি লাল গ্রানাইটের তৈরি বিপুল স্ট্রাকচার। প্রথম দর্শনেই এর বৃহদায়তন সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যে এসে থামল মন্দির থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু তারি মাঝে এই মন্দিরকে ঘিরে আশেপাশে কতোগুলো দোকান জেগে রয়েছে। পুজোর সামগ্রী সেখানেই মেলে।

ডঃ প্রসাদ প্রথমেই আমাদের নিয়ে এলেন রকের ওপর খোদাই করা মাস্টার প্ল্যান দেখাতে। যে কোনও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি এটি দেখে সেই ১১শ শতকের টেকনিক্যাল টিমকে সেলাম না জানিয়ে পারবেন না। খোলা আকাশের নীচের এই নকশা এত বছর ধরে পড়ে থেকে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক জায়গার রেখাগুলো এখন অস্পষ্ট। চারপাশে নজরে আসবে পাথরের খাদ যা হয়ত এককালে পুরো জলে ভরা থাকত। দূরে ছোট গ্রামের মতো রয়েছে। নদীতে যে জল রয়েছে তাতেই নৌকা করে ওপারে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত রয়েছে। ওপারে গিয়ে পার্বতীগুহা অনেকে দেখতে যায়। তবে গাড়ি করে রাস্তা দিয়েও যাওয়া যায়। সামনে তাকালে দৃষ্টিগোচর হবে পশ্চিম দিকে মুখ করে দন্ডায়মান ভোজেশ্বরের সেই বিশাল মন্দিরটি। এত বড় মন্দির দেখে নয়ন জুড়িয়ে যাবে পর্যটকদের। পরে স্থানীয় একজন লোকের কাছে জানতে পেরেছিলাম মোটামুটি ১০৬ ফিট লম্বা আর ৭৭ ফিট চওড়া এই মন্দিরের সাইজ।

এরপর ডঃ প্রসাদ আমাদের মন্দিরের কাছে নিয়ে এলেন সুন্দর একটি বাগানের ভেতরের পথ দিয়ে।

"আমি আপনাদের কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা ডিটেলসে পরে নিজেরা দেখে নেবেন। মন্দিরের সামনের দিকটা শিল্প-কারুকার্যে ভরা বিভিন্ন মূর্তিতে সজ্জিত,যা অত্যুৎকৃষ্ট ভাস্কর্যনিদর্শনবাহী। বাকি তিনদিকে রয়েছে ব্যালকনি যা সুন্দর সব ব্র্যাকেট আর চারটি সুন্দর থাম্বার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের পেছন দিকে এই যে উঁচু মাটির টিলা বা র‍্যামপার্ট দেখতে পারছেন এটি এত উঁচু মন্দিরের ওপর পর্যন্ত বড় বড় পাথরের ব্লক তোলার জন্য ব্যবহার করা হত। জানা গেছে এই শিবলিঙ্গের প্ল্যাটফর্মটি বানাবার জন্য প্রায় ৭০ টন ওজনের একটি পাথরের স্ল্যাব তখনকার দিনে এর সাহায্যে ওপরে তোলা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের এই পদ্ধতিতে অতো উঁচুতে মাল তোলা আজ আমাদের ভাবতে অবাকই লাগে! আমাকে এবার আমাদের কাজের জায়গায় যেতে হবে। স্থানীয় লোকের সাহায্য নিয়ে বাকীটা আপনারা দেখে নিন। আবার বিকালে দেখা হবে।"

এগিয়ে চললাম প্রধান মন্দির চত্বরের দিকে। অসমাপ্ত মন্দিরের প্রতি অংশের শিল্প-কারুকার্য পর্যটকদের কাছে চির আদরিণীয়। প্রথমেই নজরে এল নন্দীর স্ট্যাচু। মুখের সামনের কিছুটা অংশ ভাঙা। মন্দিরের দিকে মুখ তুলে বসে রয়েছে। মন্দিরের প্রবেশ দরজার ফ্রেমের সাইজ মোটামুটি ১০মি উঁচু ৫মি চওড়া। দরজার দুপাশে রয়েছে দেবী গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব খোদাই করা স্ট্যাচু। চোখে পড়ল উমা-মহেশ্বর, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ব্রহ্মা-সাবিত্রী, রাম-সীতার খোদাই করা মূর্তিগুলো। সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে নেমে এলে বোঝাই যায় এখানকার কাজ অসম্পূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। রাজা এই অবস্থায় কাজ বন্ধ করেছিলেন কেন,আজও তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। এত বিশাল শিবলিঙ্গ দেখে অবাক না হয়ে থাকা যায় না। একটি মাত্র পাথরের ব্লকে তৈরি এই লিঙ্গ। যোণিপট্ট নিয়ে লিঙ্গটি ২২ফিটের মত উঁচু। তাই এখানে এসে শিবের মাথায় ফুল-বেলপাতা চড়ানো যাবে না। মন্দিরের বাইরে ঠিক সামনের দিকে ছোট মন্দিরে পুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরের ছাদের কারুকার্যও দৃষ্টিনন্দন। পাথরের ওপর শিল্পীর অপূর্ব এই হাতের কাজ চিরদিন মনে থাকবে। সিলিং-এর বেশ কিছুটা অংশ ফাইবার গ্লাস দিয়ে সাজানো রয়েছে। বহু বছর আগে ছাদের বিরাট ওই অংশটা ভেঙে এসে যোণিপট্টকে দু টুকরোতে বিভক্ত করেছিল। এরপর বছরের পর বছর আকাশের দিকে খোলাই রয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য যোণিপট্টকে জুড়ে দেওয়া হয় আর ফাইবার গ্লাস দিয়ে ছাদের ভগ্ন অংশটুকু আটকানো হয়। চারটি বিশালাকৃতি স্তম্ভের ওপরে অনবদ্য শিল্প কারুকার্যে খোদিত গম্বুজটি সবারই প্রশংসা পেয়ে চলেছে আজও। ভেতরে আলোর অত আড়ম্বর নেই। তবুও দুপুরের সূর্যের আলোটুকু এই গম্বুজের ভেতর দিয়েই কিছুটা উজ্জ্বল করে রেখেছে মন্দিরের ভেতরটা।

বেরিয়ে এসে এবার চললাম নদীর দিকে। চারদিকে ছোট-বড় নানা সাইজের পাথর ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। এইসব পরিত্যক্ত ভগ্ন অনেক পাথরের ভেতর আজও দেখতে পাওয়া যায় তখনকার শিল্পীদের অসমাপ্ত খোদাই-এর কাজ। নদীর ওপর দিয়ে স্থানীয় লোকদের ছোট ছোট নৌকায় ঘুরে দেখে আসা যায় ভোজ রাজার অতুলনীয় কীর্তি সেই ড্যামের ক্ষত-বিক্ষত ভগ্নাবশেষ। চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এইসব পাথরের ফাঁক দিয়ে দূরে যতটা দৃষ্টি যায় প্রকৃতির সবুজ বনরেখা মন ভরিয়ে দেয় এই ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। ভোজপুর দেখার প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় বর্ষার পর। এই সময় একদিকে যেমন নদীতে জল অপর দিকে প্রকৃতিদেবী সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে সবাইকে আহ্বান করে। নৌকাতে বসে দূর থেকে মন্দিরের দৃশ্য যেন পটে আঁকা এক অপূর্ব চিত্র।

ভোজেশ্বর মন্দির ছাড়াও ভোজপুরে দেখার রয়েছে পার্বতী গুহা, জৈন মন্দির, ভোজ রাজাদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ। মন্দির কমপ্লেক্স থেকে এবার আমরা বিশাল বিশাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। অনেকটা হেঁটে তবে রাস্তার ধারের দোকানগুলোর কাছে পৌঁছালাম। সাইনবোর্ডটা এতক্ষণে নজরে এল "১০ম শতাব্দীর শিব মন্দির" ইত্যাদি। শিব মন্দিরের উল্টোদিকে আর পশ্চিম দিকে বেতোয়া নদীর মুখোমুখি রয়েছে কালো পাথরের ছোট পাহাড়। চারপাশে সবুজে ঘেরা।

বাইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্যি নেই যে এই পাহাড়ের ভেতর ঢাকা রয়েছে পার্বতী দেবীর মন্দির। ভোজেশ্বর মন্দির থেকে কিছুটা হেঁটেই এখানে আসা যায়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একে-বেঁকে রেলিং ঘেরা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। নামতে নামতে প্রাকৃতিক দৃশ্য মন ভরিয়ে দেয়। সিঁড়ির ওপর থেকেই নদীর দৃশ্য চোখে পড়ে। সিঁড়ির শেষে রয়েছে পার্বতীগুহা মন্দিরের লম্বা চত্বর। এক ভক্ত পরিবারই এই স্থানে থেকে দেবীর পুজোআচ্চা নিয়মমত করেন। এছাড়া এখানকার গণেশজীর মূর্তিটিও বেশ সুন্দর। পার্বতীগুহার গঠন প্রণালী এমন ভাবে করা হয়েছে যে সহজে বাইরে থেকে এখানে আক্রমণ করা যাবে না। ১১শ শতকের এই ভাস্কর্য-বিদ্যা প্রশংসার দাবি রাখে।

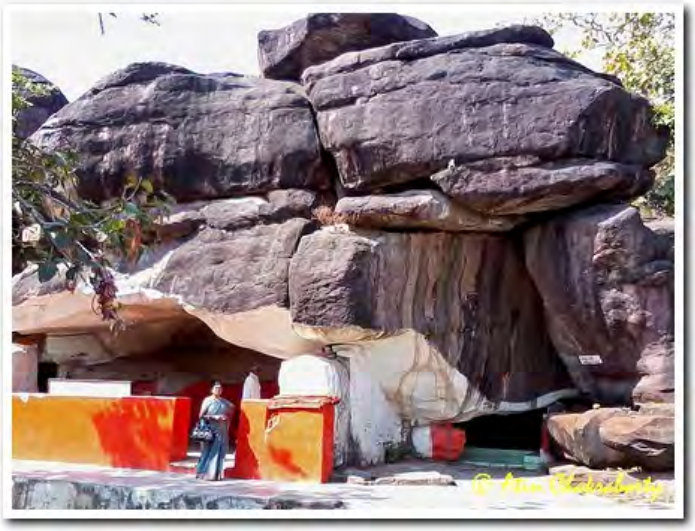

এরই কাছে রয়েছে ভোজ রাজাদের প্রাসাদের পরিত্যক্ত ফাউন্ডেশনটুকু। এই সুন্দর প্রাসাদকে কোনদিনই রক্ষা করে রাখার চেষ্টা করা হয়নি। বরং এখান থেকে নানাকিছু তুলে নিয়ে অনেকেই তাদের আধুনিক ঘরবাড়ি বানাতে ব্যবহার করেছে। এরপর আবার সেই দোকানগুলোর কাছে ফিরে এলাম। দূর থেকে ভোজেশ্বর মন্দিরকে দেখতে দেখতে কেন জানিনা মনে হল এই বর্গাকার মন্দিরটির সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্য ছাড়াও বেশ মিল রয়েছে গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পচিহ্নাদির।

একটু পরে ডঃ প্রসাদ এসে গেলেন। ওনার সঙ্গে ভোজপুরের আরেক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য জৈন মন্দিরের দেখতে চললাম। প্রাচীনকালে ভোজপুর ছিল ভারতের সংস্কৃতি-শিল্প, প্রত্নবিদ্যা-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সমন্বয়ের এক আদর্শ নগর। এই জৈন মন্দিরও তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে ভোজেশ্বর মন্দিরের মতো এর কাজও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। ২০ ফিট লম্বা চতুর্বিংশের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের স্ট্যাচুই হোল এই মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া রয়েছে পার্শ্বনাথের মূর্তি, শ্রীমানতুঙ্গের মন্দির আর তাঁর সিদ্ধি লাভের সেই নির্বাণ রক বা সিদ্ধ শিলা। সুন্দর-পরিষ্কার আয়তক্ষেত্রাকার এই জৈন মন্দিরটির কারুনৈপুণ্যতা সত্যি দেখবারই মতো।

১০-১১শ শতকের নির্মিত ভোজপুরের এই ভোজেশ্বর মন্দির, জৈন মন্দির,বা পার্বতী গুহার নিখুঁত গঠন ও আলংকারিক শিল্প কারুকার্য সে যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় আজও বহন করে চলেছে।

সূর্য প্রায় অস্তাচলে, - এবার ফেরার পালা। মনে শুধু একটাই প্রশ্ন বারবার আসছে - কেন ওই সময় ভারতের এই অমূল্য কাজগুলো সমাপ্ত করা হল না! ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় ১০৬০ সালের পর পরমারার গৌরবান্বিত অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। কল্যাণী ও গুজরাটের চালুক্যরা আর কালচুরি বংশের লক্ষ্মী-কর্ণ-এর মিলিত শক্তি রাজা ভোজের রাজধানী আক্রমণ করে। সেই রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধে রাজাকে প্রাণ হারাতে হয়। হয়ত এরপরই শেষ হয়ে যায় তাঁর সমস্ত শিল্প স্বপ্ন। যতটুকু বা উনি করে গিয়েছিলেন,তাও বছরের পর বছর অযত্নে অনেকটাই হারিয়ে গেছে কালের সমাধিতলে। এখন অবশ্য মন্দিরের রক্ষার ভার রয়েছে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ওপর।

যুদ্ধে সেদিন রাজা ভোজ হারিয়েছিলেন তাঁর পার্থিব রাজমুকুটটি, কিন্তু তাঁর গৌরবময় কীর্তিভরা এই ভোজপুর মানুষের গল্প-গাঁথায় আরেক উজ্জ্বল মুকুটের মতোই শোভা পাবে চিরদিন।

অবিভক্ত ভারতের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে জন্ম অতীন চক্রবর্তীর। সরকারি পেশা এবং ভ্রমণের নেশার টানে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লিখছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভারতের হৃদয়ের খোঁজে

সৌমিত্র বিশ্বাস

ইন্দোর-মান্ডুর আরও ছবি

মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের 'হিন্দুস্তান কা দিল দেখো'-র আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থির করলাম এবার মালওয়া বা মালব্য অঞ্চলে ঘুরে আসি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এক শনিবার সন্ধ্যায় আমরা কত্তা-গিন্নি দিল্লি থেকে ইন্দোর পৌঁছেছি বিমানপথে - দেবী অহল্যাবাই হোলকার নামাঙ্কিত নতুন ঝকঝকে বিমানবন্দর। ইন্দোর মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে বড় শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্নায়ুকেন্দ্র। একদিকে পীতমপুর আর অন্যদিকে দেওয়াস জুড়ে ব্যস্ত শিল্পাঞ্চল, বহু লোকের কর্মসংস্থান! মধ্যপ্রদেশে শিক্ষারও প্রাণকেন্দ্র ইন্দোর - সুপ্রসিদ্ধ দেবী অহল্যাবাই হোলকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ক্যাম্পাস ছাড়াও শহর ও শহরের উপকণ্ঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলি মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ভারতে ইন্দোরই একমাত্র শহর যেখানে আই.আই.টি. ও আই.আই.এম. উভয়ই রয়েছে। চারদিকে নতুন তৈরি টাউনশিপ, শপিং মল, হোটেল, নামী ব্র্যান্ডের শো-রুম ও মাল্টিপ্লেক্স-এর ছড়াছড়ি - বেশ চনমনে, প্রাণবন্ত এক শহর!

রবিবার সকালে ইন্দোর দর্শনে বেরিয়ে প্রথম গন্তব্য 'রাজওয়াড়া' - মালওয়ার পেশোয়া, হোলকারদের রাজপ্রাসাদ। ১৭৬৬ সালে পেশোয়া মলহার রাও হোলকার এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সাততলা উঁচু প্রাসাদের বিশালাকায় প্রথমাংশ বেশ সম্ভ্রমের সঞ্চার করে মনে। পাথর দিয়ে প্রথম তিনতলা মোগল ও কাঠের ব্যবহারে পরের চারতলা মারাঠা বাস্তুকলার অনুসরণে তৈরি। অধুনা প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ - মাথাপিছু দশটাকা প্রবেশমূল্য, ক্যামেরার জন্য আরও পঁচিশ টাকা। সুউচ্চ কাঠের প্রবেশদ্বার দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম এক বিস্তৃত অঙ্গণে। অঙ্গণ পার করে চোখে পড়ল প্রাসাদের দক্ষিণাংশ - একতলায় একটি গণেশ মন্দির, ওপরতলায় বিরাট সভাঘরে পেশোয়ার দরবার, আবিষ্কার করি সভাঘরের বাইরের দেওয়ালে তিনটি কারুকার্যময় মার্বেলের 'ঝরোখা'। সুচারু ভাবে সংরক্ষিত সভাঘরটি সত্যিই রাজকীয়। দোতলায় একদিকে একটি ছোট মিউজিয়াম - দেওয়ালে টাঙানো হোলকার বংশের সব পেশোয়াদের প্রতিকৃতি, ইন্দোর স্টেটের পুরনো মুদ্রা, বিদেশ থেকে পাওয়া নানারকমের উপহার সামগ্রীর সমাহার।

রাজওয়াড়া প্রাসাদ

রাজওয়াড়া থেকে বেরিয়ে ব্যস্ত দোকানপাট ও বাজার ছাড়িয়ে গেলাম 'কাঁচ মন্দির' - এক প্রাচীন কারুকার্যময় ভবনের একটি অংশে মন্দিরটি। জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার মন্দিরে মহাবীরের মর্মর মূর্তি, দেখি মন্দিরের মেঝে, সিলিং, দেওয়াল, স্তম্ভ সব রঙিন কাঁচের টুকরো দিয়ে তৈরি সুন্দর সব নকশায় শোভিত। মন্দিরে ছবি তোলা নিষেধ, রঙিন কাঁচের অভিনব নকশা ক্যামেরা-বন্দির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে একটু মনক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে আসি আমরা, এগিয়ে চলি পরবর্তী গন্তব্যের পথে।

শহরের প্রায় কেন্দ্রে হোলকারদের লালবাগ প্রাসাদ। মহারাজ শিবাজি রাও হোলকার-এর রাজত্বকালে (১৮৮৬-১৯০৩) শুরু হয় প্রাসাদটির নির্মাণ; ১৯২১ সালে নির্মাণ কার্য শেষ করেন তাঁর পুত্র ও উত্তরসূরি মহারাজ টুকোজি রাও হোলকার (রাজত্বকাল ১৯০৩-১৯২৬)। রাজওয়াড়ার মতই লালবাগ প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সামলায় মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ। এখানেও মাথাপিছু দশটাকা প্রবেশমূল্য, ক্যামেরার জন্য আরও পঁচিশ টাকা - তবে সরকারি টিকেট বিক্রেতা জানায় ছবি তোলা যাবে কিন্তু প্রাসাদের বাইরে, প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায়। একটু অখুশি হয়েই প্রাসাদের বাগানে এগিয়ে যাই - সযত্নে লালিত বাগানটির কিন্তু প্রশংসা করতেই হয় - চারিদিকে স্নিগ্ধ ছায়াঘন মহীরুহের দল, নারীমূর্তির ভাস্কর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এসবের ছবি তুলে কেটে যায় কিছুটা সময়। চোখে পড়ে বাগানের একপাশে একটি টিনের চালার নীচে অবহেলিত মহারানী ভিক্টোরিয়ার মর্মর মূর্তি। প্রবেশদ্বারে ক্যামেরা ও মোবাইল জমা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাই। প্রাসাদের বাস্তুকলা আমাদের চমৎকৃত করে - রেনেসাঁস, প্যালাডিয়ান ও বারোক স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি প্রাসাদ নিয়ে যায় আমাদের মধ্যযুগীয় ইউরোপে। প্রাসাদে ডোরিক, আয়োনিয়ান ও কোরিন্থিয়ান স্তম্ভের ব্যবহার - দেওয়ালে এবং সিলিঙে গ্রিক ও লাতিন পুরাণ চরিত্রের চিত্রায়ন ও ভাস্কর্য। লম্বা লম্বা জানালায় নকশাদার পর্দা, ঝুলন্ত বিশাল ঝাড়বাতি ও দেওয়ালে বড় বড় বেলজিয়ান আয়না। বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বদান্যতাপুষ্ট হোলকার নেটিভ স্টেটের বৈভবের চূড়ান্ত নিদর্শন!

লালবাগ প্যালেস

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়ি প্রাচীন মালওয়ার রাজধানী মান্ডুর পথে। চার লেনের প্রশস্ত জাতীয় রাজপথ নম্বর ৫৯ ধরে আমাদের গাড়ি চলে দ্রুতবেগে - প্রায় ৯৫ কিমি পথ দুঘন্টায় পেরিয়ে এসে পৌঁছই মান্ডু দুর্গের প্রবেশদ্বারে। ইতিহাসের পাতা ওলটালে মান্ডু বা মান্ডবের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীতে। একাদশ শতাব্দীতে শক্তিশালী পারমার রাজপুত রাজা ভোজ মালওয়ার রাজধানী ধার থেকে আসেন মান্ডুতে। সমুদ্রতট থেকে প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু তিনপাশে বিন্ধ্যপর্বতের অতি দুর্গম গিরিবর্ত্ম 'কোখরা খো' আর একদিকে নিমাড়ের সমতল, এইরকম জায়গায় এক নিশ্ছিদ্র দুর্গ নির্মাণের জন্য রাজা ভোজ বেছে নেন মান্ডুকে। ৮২ কিমি পরিধি জুড়ে তৈরি হয় দুর্গের প্রাচীর - রাজা ভোজের তৈরি মান্ডবগড়ে বসতি হয় নয় লক্ষ লোকের।

১৩০৫ সালে তৎকালীন পারমার রাজাকে হারিয়ে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি মান্ডু দখল করে নেন। এর প্রায় একশ বছর পরে, ১৪০১ সালে দিল্লীর তুঘলকি শাসনের টালমাটাল অবস্থায়, মালওয়ার আফগান গভর্নর, দিলওয়ার খান ঘুরি মালওয়াকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করেন - ধার থেকে মান্ডুতে স্থানান্তরিত হয় মালওয়ার রাজধানী। মান্ডুর নামকরণ হয়, 'শাহিদাবাদ' বা আনন্দনগরী! ১৪০৬ সালে দিলওয়ার খানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন তাঁর ছেলে, অলপ খান। তিনি হোশঙ্গ শাহ নাম নিয়ে রাজত্ব করেন ২৬ বছর। হোশঙ্গ শাহের ছেলে মহম্মদ শাহ বছর চারেক রাজত্ব করার পরে ১৪৩৬ সালে তাঁকে বিষ দিয়ে মেরে তাঁরই সেনাপতি মামুদ শাহ খিলজি মান্ডুতে প্রতিষ্ঠা করেন খিলজি বংশের রাজত্ব।

রাজওয়াড়া প্রাসাদের দালানে

মান্ডুর অলিতে গলিতে ও প্রাসাদের আনাচে কানাচে সিংহাসন দখলে পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং বিশ্বাসঘাতকতার করুণ উপাখ্যান ফেলে গভীর দীর্ঘশ্বাস!

আমাদের গাড়ি মান্ডু দুর্গের আলমগির দরওয়াজা, ভাঙ্গি দরওয়াজা ও দিল্লি দরওয়াজা পার হয়ে জনপদে প্রবেশ করে। অগ্রিম বুক করে রাখা মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের 'মালওয়া রিট্রিট'-এ একটি এসি ঘর পেয়ে যাই সহজেই। দোতলা ছোট হোটেলটি বেশ ছিমছাম - হোটেলের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গায় পাতাবাহার গাছ, কেয়ারি করা ফুলের বাগান ও গাড়ি পার্কিং-এর বন্দোবস্ত। রিসেপশন সংলগ্ন ক্যাফেটেরিয়াতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের ঘরের পেছনে ব্যালকনি থেকে দেখতে পাই 'কোখরা খো'র গহন খাদ। তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নভোজন সেরে বেরিয়ে পড়ি মান্ডুর পুরাতত্ত্ব দর্শনে।

মান্ডুর পুরাতত্ত্ব নিদর্শনগুলি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত - আশরফি মহল, জামি মসজিদ ও হোশঙ্গ শাহের সমাধি নিয়ে সবচেয়ে পুরনো 'ভিলেজ ক্লাস্টার' মান্ডু শহরের মধ্যিখানে। সেখান থেকে প্রায় এক কিমি দূরে 'রয়্যাল ক্লাস্টার' বা শাহী পরিসরে বিখ্যাত জাহাজ মহল, হিন্দোলা মহল ও জল মহল। আর 'ভিলেজ ক্লাস্টার' থেকে প্রায় ৬ কিমি দূরে রেওয়া কুন্ড, বাজ বাহাদুরের প্রাসাদ ও রানী রূপমতীর প্যাভিলিয়ন।

হাতে অনেক সময় - আদ্ধেক দিন বরাদ্দ করলাম 'ভিলেজ ক্লাস্টার'-এর জন্য। মান্ডুর সবগুলি সৌধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI) সংস্থার হাতে। 'ভিলেজ ক্লাস্টার'-এর সবকটি সৌধের জন্য প্রবেশমূল্য মাথাপিছু পাঁচটাকা, স্টিল ক্যামেরায় ছবি তুলতে কোনও পয়সা লাগেনা। গেট দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি চড়ে এক বিরাট চত্বর পার হয়ে আমরা পৌঁছই সার সার স্তম্ভ দেওয়া জামি মসজিদের প্রধান প্রার্থনাসভায়। প্রার্থনাসভার কেন্দ্রে রাজার বসার জন্য এক উঁচু বেদী মসজিদের পরিবেশে কেমন যেন বেমানান। পুরো মসজিদটি লাল রঙের বেলে পাথরের তৈরি। জামি মসজিদের পেছনের অংশে হোশঙ্গ শাহের মকবারা - এটি ভারতের প্রথম মর্মর সৌধ, তাজমহলের প্রায় ২০০ বছর আগে তৈরি। রাজস্থানের মকরানা থেকে আনা উচ্চমানের মার্বেলের ব্যবহার হয়েছিল এর নির্মাণে। হোশঙ্গ শাহ মৃত্যুর অনেক আগেই নিজের মকবারা তৈরি শুরু করেছিলেন - পিতৃহন্তা শাসক নিজের পুত্রের ওপর ভরসা করতে পারেননি বোধহয়! তাজমহল নির্মাণের সময় সম্রাট শাজাহান তাঁর স্থপতিশিল্পীদের মান্ডুতে পাঠিয়েছিলেন হোশঙ্গ শাহের মকবারার নকশা অনুধাবন করতে। আমাদের গাইড জানালেন হোশঙ্গ শাহের নশ্বর দেহ নাকি শেষঅবধি মান্ডুতে সমাধিস্থই হয়নি, তাঁর আসল সমাধি আছে ইটার্সির কাছে হোশঙ্গাবাদে! জামি মসজিদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে রাস্তা পার হই আমরা আশরফি মহলের উদ্দেশ্যে। বেশ কিছু অধ্যয়ন কক্ষ, ছাত্রদের অনেকগুলি বাসস্থান নিয়ে একটি বড় মাদ্রাসা তৈরি করেছিলেন মহম্মদ খিলজি আশরফি মহলে, পরে এটি রূপান্তরিত হয় সমাধিস্থল হিসাবে। দোতলায় মূল অংশটির ছাদ ভেঙে পড়েছে বহুদিন আগে, সেখানে দেখি মহম্মদ খিলজি আর তাঁর পরিবারবর্গের সমাধি। চারপাশে স্তূপীকৃত করে রাখা অনেক কারুকাজময় ধ্বংসাবশেষ। দিনের শেষে পৌঁছালাম লোহানি কেভস-এর পাশে 'সানসেট পয়েন্টে' -পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি ছোট গুহা, তাদের সামনে দিয়ে এক পাহাড়ি নালা তিরতির করে বয়ে চলেছে। সুদূরে, বিন্ধ্যপর্বতের গহন খাদের শেষে, সমতলের দিকচক্রবালে ধীরে অস্তগামী সূর্য - আকাশে তখন নানারঙের হোলিখেলা আর দলে দলে পাখির সকলরবে বাসায় প্রত্যাবর্তন।

আফ্রিকা থেকে আনা বাওবাব গাছ

মান্ডুর আশে পাশে যত্রতত্র চোখে পড়বে বাওবাব গাছ - এ গাছের গুঁড়ির ব্যাস বিশাল (২৫-৩৫ ফিট, ফেব্রুয়ারি মাসে পাতাহীন ন্যাড়া ডালপালা দেখলে মনে হয় গাছটিকে কেউ উল্টো করে পুঁতে দিয়েছে।ডালপালা তো নয়, যেন মাটির নীচের শেকড়বাকড়! কিন্তু বাওবাব তো প্রধানত আফ্রিকার গাছ,মান্ডুতে এল কি করে? বই পড়ে জানতে পারি, মহম্মদ খিলজির তেত্রিশ বছর রাজত্বে মালওয়ারের প্রভূত উন্নতি হয়, বিস্তৃত হয় মালওয়া রাজ্য। শিক্ষা প্রসারেও মহম্মদ খিলজি ছিলেন খুব সচেষ্ট। পশ্চিম এশিয়া, আরব, মিশর ও আরও আফ্রিকার দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে মালওয়ারের। সেসব দেশের রাষ্ট্রদূতেদের সৌজন্যে বাওবাব ফল ও বীজ পৌঁছয় মান্ডুতে - প্রায় ৬০০ বছরের পুরনো গাছগুলি কত না ইতিহাসের সাক্ষী!

পরদিন আমরা চলি 'শাহি পরিসর' বা সুলতানদের প্রাসাদ। এখানে ASI-এর রক্ষণাবেক্ষণের ও সৌন্দর্যায়নের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ১৪৬৯ সালে মহম্মদ খিলজির মৃত্যুতে তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিন খিলজি মালওয়ার সুলতান হন - তিনি ঊনচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। গিয়াসুদ্দিন ছিলেন বড়ই বিচিত্র স্বভাবের - যুদ্ধবিগ্রহের পথ মাড়াননি তিনি, ধর্মনিরপেক্ষ, মদ্যপানে অনাসক্তি। কিন্তু নারীসঙ্গে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার; জাহাজ মহল প্রাসাদ তৈরি করে গিয়াসুদ্দিন বসিয়েছিলেন এক বিরাট হারেম - দেশ-বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল পনেরশো বেগম! জাহাজ মহলের দুইদিকে দু'টি লেক, মঞ্জ তালাও আর কপূর তালাও, জলভরা লেকে যেন জাহাজ ভাসছে। ওই মঞ্জ আর কপূর তালাও-এর জলে মেশান হত সুগন্ধী ভেষজ দ্রব্যাদি - নিয়মিত সাঁতার দিতেন বেগমরা ওই লেকের জলে, এতে তাঁদের চুল কালো ও শরীর সুঠাম থাকত। জাহাজ মহলে দুই দেওয়ালের ভেতরে জল সরবরাহ করা হত, মহলে ফুলের আকারে অনেক ছোট ছোট জলাধার - মধ্যভারতের গ্রীষ্মে বাতানুকূল পরিবেশ সৃষ্টির অভিনব প্রচেষ্টা! জাহাজ মহলের ছাদ থেকে পুরো শাহী পরিসরের দৃশ্য বড়ই মনোরম।

হিন্দোলা মহল

পায়ে পায়ে পৌঁছে যাই হিন্দোলা মহলে - এখানে গিয়াসুদ্দিন সভা করতেন, লোকেদের দর্শন দিতেন। হিন্দোলা মহলের নীচ দিয়ে চলে গেছে অনেক গোপন সুড়ঙ্গ পথ, তাদের কোনওটা গেছে একেবারে মান্ডু শহরের বাইরে, কোনওটার মধ্য দিয়ে রূপমতীর পালকি চড়ে বাজবাহাদুরের প্রাসাদ অবধি যাওয়ার ব্যবস্থা! একটি সুইমিং পুলের নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত। দেখেশুনে মনে হল গিয়াসুদ্দিন প্রাণভয়ে ভীত ছিলেন বেশ। মাটির তলায় অত সুড়ঙ্গ, তাই হিন্দোলা মহলের কোনও ভিত নেই। মহল তৈরি হয়েছে সারি সারি খিলান দিয়ে, খিলান ও মহলের দেওয়াল মাটির কাছে খুব মোটা, কাত হয়ে উঠেছে - ধীরে ধীরে পাতলা হয়েছে ওপরে গিয়ে। বৃষ্টি পড়লে মনে হয় মহলটি যেন দুলছে - তাই হিন্দোলা মহল!

আরও একটু এগিয়ে দেখি বেগমদের হামাম - বাদশাহী স্নানঘর, গোলাপ জলের বাথটাব থেকে ঝাঁঝরি দিয়ে বেরোনো স্টীম দিয়ে সওনার এলাহি ব্যবস্থা। চারপাশে রানীমহল, জলমহল ও অন্যান্য অনেক ছোট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দেখি চম্পা বাউরি - প্রাসাদের জন্য পেয় জলের সুগভীর উৎস। ছবি তুলে রাখি শাহী পরিসরের বাস্তুকলার নিদর্শনের। জাহাজ মহলের সামনের বাগানে দু'জনে বসে ভাবি কাল ধীরে গ্রাস করে সব ঐশ্বর্য, বৈভব ও ঔদ্ধত্ত - সাক্ষী রয়ে যায় নীরব পাথরের প্রাসাদ।

রূপমতীর প্রাসাদে

মান্ডু-তে আমাদের অন্তিম দ্রষ্টব্য - রূপমতীর প্যাভিলিয়ন। ইতিহাস বলছে ১৫৪২ সালে মালওয়া জয় করেন শের শাহ সুরি; মালওয়ার শাসনভার শের শাহ অর্পণ করেন তাঁর সেনাপতি শুজাত খাঁয়ের হাতে। বারো বছর পর শুজাত খাঁ মারা গেলে তাঁর ছেলেদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতা দখলের লড়াই। ভাইদের হারিয়ে মিঞা বায়াজিদ ১৫৫৫ সালে মালওয়ার সিংহাসন দখল করে নিজের নাম পালটে রাখলেন বাজ বাহাদুর। মান্ডুর আশে পাশে শিকার করতে করতে বাজ বাহাদুর পৌঁছন ধর্মপুরীতে। সেখানে রূপমতীর অপূর্ব কণ্ঠে রাগ বসন্ত শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন বাজ বাহাদুর, রূপমতীকে নিয়ে যেতে চান মান্ডুতে। অপরূপ সুন্দরী রাজপুত কন্যা রূপমতী মান্ডু যেতে রাজী হন একটি শর্তে - তিনি যেন মান্ডু থেকে রোজ নর্মদা দর্শন করতে পারেন। কথিত আছে যে প্রায় রাতারাতি বাজ বাহাদুর তৈরি করান মান্ডুর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রূপমতীর প্যাভিলিয়ন, যেখান থেকে নর্মদা চোখে পড়ে সহজেই। তার অনতিদূরেই বাজবাহাদুরের নিজের প্রাসাদ। প্রায় ৭-৮ কিমি দূরে 'শাহী পরিসর' থেকে পালকি চড়ে রূপমতী আসতেন রোজ নর্মদা দর্শনে। সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে বাজবাহাদুর ও রূপমতীর মধ্যে হ'ল গভীর প্রেম। দুজনেই সঙ্গীত সাধনায় একাত্ম হতেন। এত সুন্দর প্রণয়কাহিনির পরিণতি কিন্তু বিয়োগান্তক। ১৫৬১ সালে সম্রাট আকবর প্রেরিত সেনাপতি আদম খাঁ মান্ডু আক্রমণ করলে বাজবাহাদুর যুদ্ধে হার স্বীকার করে পালিয়ে যান। আর আদম খাঁয়ের কাছে অবমাননার ভয়ে রূপমতী বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

অনেকটা চড়াই উঠে ও তারপর বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছই রূপমতীর প্যাভিলিয়নে, দূরে দেখা যায় নর্মদার স্রোত। বিন্ধ্যপর্বতের কোলে মান্ডু উত্তরাবর্তের শেষ সীমা - মান্ডুর দক্ষিণে নর্মদার দিকে দাক্ষিণাত্যের সমতল সুদূর বিস্তৃত ও বড়ই সুদৃশ্য। নীচে নেমে বাজবাহাদুরের প্রাসাদ ঘুরে দেখি। একটি বেশ বড় সুইমিং পুল প্রাসাদের কেন্দ্রে - সেখানে জল আসত কি করে? আমাদের গাইড জানায় নীচের রেওয়া কুন্ড থেকে 'ফেরিস হুইল' ঘুরিয়ে জল উঠত প্রাসাদের সুইমিং পুলে!

গাইড আমাদের থামতে বলে রাস্তার ধারে, দেখায় দূরে দাই-কি-মহল আর দাই-কি-বহেন-কি-মহল, রাজা-রাজড়াদের ধাত্রীদের বাড়ী। গাইড চেঁচিয়ে বলে, 'হ্যালো', পরিষ্কার শুনি প্রতিধ্বনি, হ্যালো! একটু সরে গিয়ে বলে, 'হ্যালো...' প্রতিধ্বনি ফিরে আসে দু'বার, হ্যালো-হ্যালো... এ নাকি মান্ডুর ইকো পয়েন্ট!

সেদিন শিবরাত্রি - গাইড আমাদের নিয়ে চলে নীলকণ্ঠ মন্দিরে। প্রায় পঞ্চাশ ধাপ সিঁড়ি নেমে পৌঁছই মন্দির প্রাঙ্গণে। মন্দিরের এক প্রান্তে গভীর গিরিখাদ। মন্দিরটি আদতে ছিল মোগল সৈন্যদের বিশ্রামাগার, দেওয়ালে খুঁজে পাই আরবী লিপি - সম্রাট আকবর সেখানে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পাহাড়ের ফাটল থেকে ক্রমাগত জল পড়ে যাচ্ছে শিবলিঙ্গের মাথায়। শিবরাত্রির পুজোয় অনেক স্থানীয় দর্শনার্থীদের ভিড় - মহিলারা এসেছেন দলে দলে, মন্দিরের চারপাশে বসে নিজেরাই মাটির শিব গড়ে, নাচগান করে পুজো উদযাপন; বেশ একটা সুন্দর উৎসবের পরিবেশ।

শেষ হল আমাদের মান্ডু ভ্রমণ - আনন্দনগরীকে বিদায় জানিয়ে আমরা নর্মদাতীরে শিবতীর্থ ওঙ্কারশ্বরের পথ ধরি।

ইন্দোর-মান্ডুর আরও ছবি

পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সৌমিত্রের ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতা ও খড়গপুর-এ; শিক্ষালাভ আই আই টি-খড়্গপুর ও আই আই এম-কলকাতায়। অধুনা নয়াদিল্লি নিবাসী, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকে কর্মরত। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বহু দেশে ভ্রমণ। লেখালিখি করছেন অনেকদিনই - বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই বেশি, কিছু ভ্রমণকাহিনি - তবে এর আগে সবই ইংরেজিতে। বিশেষ শখ ফোটোগ্রাফি।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 6
গড় : 4.50

Like 31 people like this. Be the first of your friends.

tell a Friend

নরওয়ের বন্দর শহরে

কণাদ চৌধুরী

~ নরওয়ের আরও ছবি ~

শৈশবে কোনও এক জন্মদিনে উপহার পেয়েছিলাম একটি বই -"দেশে দেশে রাণা"। কে দিয়েছিলেন, কে লেখক সেসব এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে বইয়ের নায়ক একটি কিশোর যার নাম রাণা, সে তার এক ভবঘুরে কাকার সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ। দেশগুলির বৈশিষ্ট আর দর্শনীয় যা কিছু আছে, রাণার চোখ দিয়ে দেখছে পাঠক। কোনও আর্টপ্লেটে ছাপা ঝকঝকে ছবি ছিল না বইটিতে, ছিল শুধু শিল্পীর হাতে আঁকা নানাদেশের দ্রষ্টব্যস্থানগুলির কয়েকটি রেখাচিত্র। অসম্ভব আকর্ষণীয় ছিল বইটি আমার কাছে, আমার পড়া প্রথম ভ্রমণকাহিনি। "নিশীথ সূর্যের দেশ" বা "The Land Of Midnight Sun" কথা কয়টির সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়, এটা ছিল বইটিতে নরওয়ে নিয়ে লেখা প্রচ্ছদটির শিরোনাম।

ডেনমার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে, এই তিনটি দেশকেই একত্রে স্ক্যান্ডেনেভিয়া (Scandinavia) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পেনিনসুলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নরওয়ের আয়তন প্রায় তিনলক্ষ পঁচাশি হাজার বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় শতকরা এগারো ভাগ। আর জনসংখ্যা সাড়ে একান্ন লক্ষ, আমাদের দেশের শতকরা চার ভাগ। পাহাড়, জঙ্গল, ফিওর্ড, গ্লেসিয়র এবং নদীবহুল এই দেশের প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ এলাকা জনবসতিহীন। আর্থ-সামাজিক বিকাশের নিরিখে নরওয়ে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত এবং ধনী দেশ। দেশের অর্থনীতি মূলত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়াও নরওয়ে নানা জলজ এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রাজা দেশের সাংবিধানিক প্রধান হলেও, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীই হলেন সরকারের আসল ব্যক্তি। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য অনেকেরই বিবেচনায় নরওয়ে পৃথিবীর একটি অন্যতম সুন্দর দেশ। এই দেশটিতে কয়েকদিনের জন্য ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগে, এই লেখাটি সেই ভ্রমণেরই একটি দিনের দিনলিপি।

নরওয়ের কথা বলতে গেলেই এদেশের যে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যটির কথা প্রথমেই মনে আসে, সেটা হল ফিওর্ড। লক্ষ লক্ষ বছর আগে, তুষারযুগের গ্লেসিয়ার সরতে থাকার সময় পাহাড়ের মাঝে যে গভীর খাঁজের সৃষ্টি করেছিল, সেখানে সমুদ্রের জল ঢুকে তৈরি হয়েছিল এই সব ফিওর্ড। নরওয়ের প্রায় সর্বত্রই ফিওর্ড উপস্থিত থাকলেও, দেশের পশ্চিমদিকটিতে রয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত ফিওর্ড, যার দুই পাশে উঠে গিয়েছে উঁচু পাহাড়, আর মাঝখানে দীর্ঘ সুগভীর জলরাশি। গভীরতার কারণে বড় বড় জাহাজ অনায়াসেই চলাচল করতে পারে এই ফিওর্ডগুলি দিয়ে। এইরকমই একটি বিখ্যাত,নরওয়ের দ্বিতীয় দীর্ঘতম ফিওর্ড হল হারডাঞ্জেরফিওর্ড (Hardangerfjord)। নরওয়ে ভ্রমণের প্রথম দিনে আমরা রয়েছি সেই ফিয়র্ডের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি গ্রামে, যার নাম নরহাইমসুন্ড (Norheimsund)। গ্রাম বলতে যে অনগ্রসরতার ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে, এটা তার থেকে অনেকটাই অন্যরকম। ঝকঝকে সুদৃশ্য বাড়িঘর, দোকান, প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা নিয়ে যথেষ্টই সমৃদ্ধ জায়গা নরহাইমসুন্ড। আমাদের হোটেলটি হারডাঞ্জেরফিওর্ড-এর একটি ছোট্ট খাঁজের একেবারে মাথায় অবস্থিত। ফিয়র্ডের বিশাল ব্যাপ্তি এখানে অনেকটাই কমে এসেছে। ফিয়র্ডের কিনারায় হোটেলের লনে বসে দেখতে পাচ্ছি দূরে বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়া, ঠিক অপর পারে কাছেই যে ছোট পাহাড়টি রয়েছে সেটি সবুজে ঢাকা, সব মিলিয়ে পরিবেশ অতি সুন্দর। এই সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে পাহাড়ের কোলে সাজানো ছোট ছোট কটেজ ধাঁচের বাড়িগুলো, মনে হচ্ছে একেবারে ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে তুলে আনা দৃশ্য। ঘড়িতে রাত নটা বেজে গেলেও আকাশে পরিষ্কার দিনের আলো। স্বাভাবিক আলোতে ছবি তুলতে কোন অসুবিধাই হচ্ছেনা। মাথার ওপর দিয়ে ক্রমাগত উড়ে চলেছে সিগালের ঝাঁক, হলুদ বেঁকানো ঠোঁট আর তেল চকচকে সাদা গায়ের রঙ, থেকে থেকেই তাদের কর্কশ গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ফিয়র্ডের ধার দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম আমরা। হোটেলের পাশেই দেখলাম একটা পুরোনো কাঠের লগ-হাউস সংরক্ষিত করে রাখা আছে। পাশের ইনফর্মেশন-বোর্ড দেখে জানা গেল বাড়িটি অনেক আগে স্থানীয় কৃষকেরা ব্যবহার করত। কিছুটা দুরে একটি সুন্দর পার্ক, পার্কের পাশে ফিয়র্ডে স্নান করার একটা বাঁধানো ঘাট তৈরি করা আছে, সঙ্গে একটা ছোট ডাইভিং প্লাটফর্মও আছে দেখলাম। একটু ঘোরাঘুরি শেষ করে ফিরে এলাম হোটেলে, কাল সকালে উঠে আমাদের যেতে হবে বার্গন (Bergen)।

রাজধানী অসলো-র পরে বার্গন হল নরওয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। রোমের মত বার্গনও সাতটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা শহর। আনুমানিক ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত ওই শহর নরওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। অতীতে নরওয়ের সঙ্গে ইউরোপের বাকি অংশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল এই বার্গন। এখনও শহরটি নরওয়ের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র এবং দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান। নরওয়ের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - "The Bergen International Festival" এই শহরেই অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। নরওয়ের দুটি প্রধান ফিওর্ড, হারদাঙ্গরফিওর্ড এবং সনফিওর্ড (Sognfjord) কাছাকাছি হওয়ার জন্য ইউরোপীয় পর্যটকদের কাছে বার্গন ফিওর্ড সফরের এক জনপ্রিয় প্রবেশদ্বার। গ্রীষ্মের ভরা পর্যটক মরশুমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় প্রমোদতরণী পর্যটকদের নিয়ে বার্গন-এর বন্দরে নোঙর ফেলে। বার্গন-এর অবশ্য বদনাম রয়েছে তার খামখেয়ালি আবহাওয়ার জন্য। যখনতখন বৃষ্টি নামে এখানে। আমাদের গাইড বলছিলেন যে এখানে নাকি বাগদানের সময় ছেলেরা মেয়েদের অঙ্গুরীয়ের বদলে ছাতা উপহার দিয়ে থাকে সচরাচর। তিনি ক্রমাগত সাবধান করে চলেছেন সঙ্গে ছাতা নিয়ে বেরোনোর জন্য, আর সেই কথামত আমরা সকলেই এক-একজন ছত্রধর হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। নরহাইমসুন্ড থেকে বাসে বার্গন আশি কিমি রাস্তা, পৌঁছতে সময় লাগলো এক ঘন্টার কিছু বেশি। বৃষ্টির বদলে ঝকঝকে নীল আকাশ আর একরাশ রোদ্দুর নিয়ে বার্গন আমাদের স্বাগত জানাল।

নরহেইমসুন্ড-এ হারডাঙ্গারফিওর্ড

নরওয়েতে ফিওর্ডগুলি স্থলভূমির ভিতরে ঢুকে এসেছে অনেকটাই, তার গায়ে গায়েই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জনবসতি। ফিয়র্ডের নীল জলের ধারে পাহাড়ের কোলে বার্গন শহর, একদিকে বার্গন ফিওর্ড, অন্যদিক থেকে অনেকটা যেন মুক্তমঞ্চের দর্শকাসনের মত উঠে গিয়েছে পাহাড়, এই দুইয়ের মাঝে গড়ে উঠেছে বসতি। বার্গন শহরে ঢোকার সময় দেখতে পাচ্ছিলাম কাঠের তৈরি সুন্দর সাদা রঙ করা বাড়ি, আর বাড়িগুলির পাশের সরু-সরু পাথরের রাস্তাগুলি। অনেক বাড়িতেই দেওয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে সুদৃশ্য নৌকার আকারে গাছের টব, রঙিন ফুলে ভরা। বাস আমাদের নিয়ে এল শহরের কেন্দ্রে মাউন্ট ফয়েন (Mount Floyen)-এর নীচে। বার্গন-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ফয়বানেন(Floibanen) আজ আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য। প্রথমে যদিও মনে হয়েছিল এটি একটি ট্রেন, কিন্তু পরে দেখা গেল এটি আদপে ফিউনিকুলার(funicular), অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে পাতা রয়েছে লাইন, তার ওপর দিয়ে কেবল-এর সাহায্যে দুটি কেবল কার ওঠানামা করছে। এই ফয়বানেন আমাদের নিয়ে যাবে মাউন্ট ফয়েন-এর শীর্ষে, মাটি থেকে প্রায় এক হাজার ফিট ওপরে, যেখান থেকে নীচের বার্গন শহরের বিহঙ্গমদৃশ্য আমরা দেখতে পাব। কেবল কারের স্টেশনের সামনে দর্শনার্থীদের একটি নাতিদীর্ঘ লাইন, আমাদের টিকিটের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল, সুতরাং স্টেশনে ঢুকে পড়লাম। কার-এর উপরিভাগ কাঁচের, সুতরাং পারিপার্শ্বিকের সবটাই দৃশ্যমান, প্রায় আশি জন চড়তে পারে একসঙ্গে। মিনিট সাতেক চলার পরেই উঠে এলাম পাহাড়ের একেবারে ওপরে। ওপরের এই স্টেশনটির নাম ফয়েন (Floien)। পাহাড়ের গায়ে ব্যালকনি, সেখানে দাঁড়ালে নীচের শহরকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর পর্যটকের ভিড়, অনেকক্ষণ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলাম সে দৃশ্য। পাহাড়ের ওপরটি অনেকটা সমতল, মনে হবে প্রকৃতি একটি গোলাকার গ্যালারি বানিয়ে রেখেছে নীচের শহরকে দেখার জন্য। জল এবং পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুন্দর শহরটি, বেশ কয়েকটি বড় বড় জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেলেছে দেখতে পেলাম। ওপরে রয়েছে একটি কাফেটেরিয়া এবং একটি স্যুভেনিরের দোকান। কেবল কার ছাড়াও হেঁটে পাহাড়ের ওপরে উঠে আসা যায়, সে ব্যবস্থাও আছে। স্যুভেনিরের দোকান থেকে টুকটাক দু-একটি জিনিস কিনে নিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওপরে কাটানোর পরে এবার নেমে আসার পালা। নীচে নেমে দেখলাম অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের লাইন এখন অনেকটাই লম্বা হয়ে গিয়েছে। প্রচুর লোক অপেক্ষা করছেন স্টেশনের বাইরেও।

এবার শহর ঘুরে দেখার পালা। পার্কিং-এর অসুবিধার জন্য বাসে করে ঘোরা সম্ভব নয়, তাই বাস আমাদের নামিয়ে দেবে শহরের কেন্দ্রস্থলে, সেখান থেকে হেঁটে যতটা পারি ঘুরে দেখে নেওয়ার জন্য বরাদ্দ সময় তিন ঘণ্টা, তারপর আমাদের ফিরতি পথের যাত্রা শুরু হবে।

বার্গেনের মাছের বাজার

বাস আমাদের নামিয়ে দিল Fisketorget অর্থাৎ মাছের বাজারের ঠিক পাশে। বাঙালিকে মাছের বাজার দেখতে বলায় একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও জানলাম, এই বাজারটি বার্গন-এর অবশ্যদ্রষ্টব্য জায়গা। সমুদ্রজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে, আর স্যামন (Salmon) মাছের সর্বপ্রধান রপ্তানিকারক এই দেশ। সুতরাং মাছের বাজার এদেশে যে একটা বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যস্থান হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! নরওয়েবাসীদের খাদ্যতালিকায় মাছের একটা বিশেষ জায়গা আছে, যদিও মাছের তৈরি পদগুলি, অন্তত হোটেলে যেভাবে পরিবেশিত হতে দেখেছি, সেটা আমাদের তৃপ্ত করতে পারেনি। আমাদের রসনা মাছের ওইধরনের রান্নার স্বাদে অভ্যস্ত নয়। বন্দরের এক প্রান্তে ছোট ছোট লাল তাঁবুর নীচে বাজার -ক্রেতা এবং দর্শনার্থীর ভিড়ে বোঝাই। নানা রকমের মাছ বিক্রি হচ্ছে, যেগুলোর কোনটাই আমাদের পরিচিত নয়, শুধু কিছু চিংড়ি জাতীয় মাছ, আর কমলা রঙ দেখে কাটা সামন মাছ চিনতে পারলাম। কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখা আছে বিচিত্র দেখতে কিছু জলজ্যান্ত সামুদ্রিক প্রাণী, সেগুলোও বিক্রির জন্য। বিক্রেতাদের হাঁক-ডাক আমাদের মাছের বাজারের মনে করালেও, বাজারের পরিচ্ছন্নতা তাকিয়ে দেখার মতো। যারা মাছ কাটছেন বা বিক্রি করছেন, সকলের গলায় ঝুলছে অ্যাপ্রন আর হাতে প্লাস্টিকের দস্তানা, বাজারে একটুও জল-কাদা নেই। মাছ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রান্না করা খাবারও পাওয়া যাচ্ছে দেখলাম অনেক স্টলে। মাছ ছাড়াও বিক্রি হচ্ছে নানা রকমের ফল, স্ট্রবেরি, কলা, আঙ্গুর ইত্যাদি। বারো নরওয়েজিয়ান ক্রোনার (Norwegian Kroner) অর্থাৎ প্রায় একশো টাকা দিয়ে চারটে কলা কেনা হল।

মাছের বাজার দেখা শেষ করে এবার আমরা চললাম এর পাশেই বার্গন-এর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ব্রিগেন (Bryggen) দেখতে। যে জায়গাটিতে আমরা রয়েছি, সেটি আসলে একটি হোয়ার্ফ (Wharf), অর্থাৎ যেখান থেকে জাহাজে যাত্রী এবং পণ্য ওঠানামা করে। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক অবধি এই জায়গাটি ছিল বার্গন-এর প্রধান সামুদ্রিক আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য-কেন্দ্র। জার্মান ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন মূলত এই ব্যবসাটি নিয়ন্ত্রণ করত, যার নাম ছিল হানসেয়াটিক লিগ। সেই সময়কার কাঠের তৈরি গুদামঘরগুলিই ব্রিগেন - এখন একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। আসল বাড়িগুলি বেশ কয়েকবার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে, সেই নির্মাণশৈলী ও স্থাপত্য বজায় রেখে পুনর্নির্মিত হয়েছে বর্তমান একষট্টিটি বাড়ি। একইরকম দেখতে কিন্তু বিভিন্ন রঙের সারিবদ্ধ প্রতিটি বাড়িই কাঠের তৈরি, পিছনে উঠে গিয়েছে পাহাড়, সামনে বিশাল চত্বর, তারপরে রাস্তা পেরিয়ে লম্বা জাহাজঘাটা। রাস্তার ধারে উন্মুক্ত চত্বরে খাদ্য এবং পানীয়ের কয়েকটি দোকান, মেঘমুক্ত দিনে রোদ পোহানো আর সঙ্গে সুখাদ্য এবং পানীয়, সবই সমান তালে উপভোগ করছেন অনেক পর্যটক। অধিকাংশ বাড়ির নীচেই এখন স্যুভেনিরের দোকান। বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে ঘুরে ফিরে কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়, তারপর জাহাজঘাটে এসে বসলাম। বন্দরে লাগানো রয়েছে অসংখ্য নৌকো, নীল আকাশে ভাসমান সাদা মেঘের প্রেক্ষাপটে নৌকোর নানা রঙের মাস্তুলগুলো একেবারে ছবির মত লাগছে। বার্গন-এর বিখ্যাত বৃষ্টির দেখা নেই, ঝলমলে সূর্যস্নাত দিন, রোদের তাপ এবার বেশ গায়ে লাগছে। বৃষ্টির আশঙ্কায় যে ছাতা আনা হয়েছিল, সেগুলো রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা শুরু করলেন আমাদের কয়েকজন সহযাত্রিণী। কিন্তু তাতে এক কৌতুকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, স্থানীয় অনেকেই আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, কয়েকজন ছবিও তুলে ফেললেন। শেষে এক মেমসাহেব একগাল হেসে ছাতা দেখিয়ে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, "Why this, it's not raining ?" সত্যিই তো, যে দেশে ছয়মাস সূর্যের আলো দেখা যায়না, সেখানে রোদ্দুর যে কী মহার্ঘ বস্তু, সেটা আমাদের মত কর্কটক্রান্তীয় দেশের লোকেরা বুঝে উঠতে পারবেনা। রোদ উঠলে এদেশে লোকে ঘরে বসে থাকেনা, রোদ্দুরকে যতটা সম্ভব উপভোগ করার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে, গায়ে লাগিয়ে নেয় সূর্যের দুর্লভ কিরণ। আর সেই দেশে আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে রোদ ঠেকানোর চেষ্টা করছি, সেটা ওদের কাছে এক অতীব বিচিত্র দৃশ্য।

ব্রিগেন ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিল্ডিংস

বার্গন থেকে ফেরার পথে বাস থামলো নরহাইমসুন্ড-এর উপকণ্ঠে একটি ছোট গ্রামে। গ্রামের নাম স্টাইন (Steine)। এই গ্রামে রয়েছে নরওয়ের আর একটি অন্যতম দর্শনীয় আকর্ষণ, স্টাইনডালফসেন (Steindalfossen) জলপ্রপাত। লেক মাইক্লাভাটনে (Myklavatnet) থেকে বেরিয়ে আসা ফসেলভা (Fosselva) নদী প্রায় দেড়শ ফিট ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে নীচে, জুন মাসের বরফগলা জলে প্রপাতের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি, বিপুল জলরাশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বহুদূর থেকে। জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলহেলম এই জলপ্রপাতটিকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতিটি গ্রীষ্মেই তিনি এসেছিলেন এই জলপ্রপাতটি দেখতে, এতটাই প্রিয় ছিল তার কাছে এই জায়গাটি। এই জলপ্রপাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর জলের ধারা পাহাড়ের ওপর যেখান থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ছে, ঠিক তার নীচেই পাহাড়ে একটি গভীর খাঁজ রয়েছে। রাস্তা উঠে গিয়েছে সেই খাঁজের ভিতরে, জলধারাটির ঠিক পিছন দিয়ে জলপ্রপাতের একধার থেকে অন্য ধারে। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া জলের ধারার পিছনটিতে দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতকে উপভোগ করাটা এক রোমাঞ্চকর এবং দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বাস যেখানে দাঁড়াল, সেখান থেকে রাস্তা ধরে আমরা উঠে গেলাম জলের ধারার পিছনে, সুন্দর রেলিং দেওয়া বাঁধানো রাস্তা, জলের পিছনে দাঁড়ালে গায়ে একটুও জলের ছাঁট লাগছেনা। ওপর থেকে নীচের দৃশ্যটিও অতি মনোরম, পাহাড়ের কোলে ছোট্ট সবুজ উপত্যকা, সেই সবুজ প্রান্তরের ধার দিয়ে চলে গিয়েছে নদী, নদীর ধারে ছোট গ্রামের কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ি, দূরে দেখা যাচ্ছে নরহাইমসুন্ড আর তার পিছনের বরফাবৃত পাহাড়চূড়া। কিছুটা সময় কাটিয়ে নেমে এলাম নীচে, এবার ফিরব হোটেলে। আমাদের আজকের ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ।

এর পরে আমাদের সফরসূচীতে রয়েছে নেরোফিওর্ড (Naerofjord)-এ জাহাজ সফর, সুযোগ পেলে সেই গল্প বলা যাবে আর এক দিন।

স্টেইনডালফসেন জলপ্রপাত

~ নরওয়ের আরও ছবি ~

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা এবং পরবর্তী সময়ে কর্মজীবন কেটেছে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থায়। অবসরজীবনে কণাদ চৌধুরীর সময় কাটে বেহালা বাজিয়ে, নানান ধরনের গান-বাজনা শুনে, বই পড়ে, ফেসবুকে এবং সুযোগ পেলে একটু-আধটু বেড়িয়ে। লেখালেখির জগতে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অ্যাজটেকদের দেশে

শ্রাবণী বন্দোপাধ্যায়

~ মেক্সিকোর আরও ছবি ~

মার্কিনমুল্লুকে নিউজার্সিতে বসে এক এক সময় মনে হয় শীতকালটা যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। জানলা দিয়ে তুষারপাত দেখতে দেখতে তাদেরকে শ্বেতশুভ্র বা পবিত্র যে নামেই ভূষিত করিনা কেন মনটা কিন্তু পাখা মেলে চলে যায় কোনও একটি গরমের দেশে বা সমুদ্র সৈকতে। এইভাবেই চিন্তা করতে করতে মনে পড়ে গেল বহুযুগ আগে দেখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী মেক্সিকো দেশটির কথা। মেক্সিকো যাওয়ার চিন্তা করছি শুনেই এক শুভাকাঙ্খী বন্ধু টেলিফোনেই তেড়ে উঠে বললেন – 'বলি তোমরা কর্তাগিন্নি কি সারাক্ষণ পায়ে চাকা লাগিয়েই আছ? ওখানে তো শুনি চতুর্দিকেই কিডন্যাপিং, খুন, ডাকাতি আর ড্রাগের কারবার।' আহা কথাগুলি যেন কর্ণকূহরে কেউ রহস্য রোমাঞ্চের মধু ঢেলে দিল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মার্ক টোয়েন বর্ণিত নেটিভ ডাকাত ইনজুন্ জো-এর মুখচ্ছবি। যে কিনা এই বয়সেও রঘু ডাকাত পড়ে আনন্দ পায় তাকে দাবিয়ে রাখা অত সহজ নয়, তাই পুরনো স্মৃতির ধুলো ঝাড়তে কিছুদিন আগে আবার সেই মেক্সিকোর পথেই রওনা হলাম।

আজ যাকে আমরা 'মেক্সিকো সিটি' বলে জানি একসময় তার নাম ছিল 'টেনোশটিটলান'। বারো হাজার বছর আগে যখন এশিয়া ও আমেরিকা উত্তরে বেরিং প্রণালীর কাছে যুক্ত ছিল, সেই সময়ে এশিয়ার মঙ্গোলিয়া অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করে আজকের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ যাযাবরই থেকে যায় আবার কোনও কোনও সম্প্রদায় ভুট্টা বা বীনের চাষ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এইভাবেই তিনটি সভ্যতার জন্ম হয়- আজকের গুয়েতেমালা অঞ্চলে 'মায়া', পেরুতে 'ইনকা' ও মেক্সিকোতে 'অ্যাজটেক'। প্রচলিত উপকথা বলে, সূর্যদেবতা অ্যাজটেকদের স্বপ্ন দিয়ে বলেছিলেন – 'পথে চলতে চলতে যেখানে দেখবে একটি ঈগল পাখি মুখে সাপ ঝুলিয়ে কাঁটা ঝোঁপের ওপর বসে আছে ঠিক সেখানেই তোমরা রাজ্য স্থাপনা করবে। আজকের মেক্সিকোর ফ্ল্যাগের মধ্যিখানে সেই ছবিটিকেই আমরা দেখতে পাই। চতুর্দিকে জলাভূমির মধ্যে একটি দ্বীপের ওপর ঈগলটিকে দেখে তারা জায়গাটির নাম দেয় 'টেনোশটিটলান' অর্থাৎ ওদের ভাষায় কাঁটা ঝোঁপের বাসস্থান।

অ্যাজটেকদের শেষ রাজা 'মনটেজুমা' নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন সাদা বা ফর্সা রং-এর 'কেটজালকোটেল' নামে এক ভগবান এসে তাদের ভালো করবেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস চোদ্দশো বিরানব্বই-এ এই নতুন মহাদেশটি আবিষ্কার করার কিছু বছর পর যখন স্পেন থেকে 'হারনান্ কোর্টেজ' তিনটি জাহাজ ভর্ত্তি অস্ত্রসস্ত্র ও দলবল নিয়ে এই জায়গাগুলি দখল করতে আসে তখন রাজা 'মনটেজুমা' তাকে সেই ভগবান ঠাউরে সোনাদানা ও দামী দামী উপহার দিয়ে সসম্মানে আপ্যায়ণ করেন।

অ্যাজটেকরা কোনওরকম লোহার যন্ত্রপাতি ছাড়াই সতেরো কিলোমিটার জুড়ে বাঁধ দিয়ে, ব্রিজ বানিয়ে এবং চতুর্দিকে নৌকা নিয়ে যাতায়াতের জন্য বড় বড় খাল কেটে এই জলাভূমিটিকে এতটাই সুন্দর করে সাজিয়েছিল যে প্রথম দর্শনেই স্প্যানিয়ার্ডরা এই শহরটিকে দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় সেই সময়ে এই শহরে আড়াই লক্ষ লোক বাস করত। অ্যাজটেকরাই প্রথম মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে জোর দেয় এবং তাদের জন্য স্কুল খোলে। বিভিন্ন ভেষজ লতাপাতাকে চিকিৎসার কাজে লাগানোর জন্য তাদের নানা গবেষণাগার ছিল। শুধু তাই নয় আজকে যে ইটালিয়ানদের একদিনও টমেটো ছাড়া চলে না সেটিও এই অ্যাজটেকদেরই অবদান।

কোর্টেজ-এর বড় বড় জাহাজগুলি দেখে এই সরল মানুষগুলি মনে করেছিল ভগবান তার সঙ্গে কিছু দ্বীপও ভাসিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং ঘোড়াগুলি ভগবানদের বাহন অর্থাৎ একটু বড় মাপের হরিণ। অবশেষে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যতই যুদ্ধ করুক না কেন কামানের সামনে তীর-ধনুকের বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব নয়, তাই কিছুদিনের মধ্যেই অ্যাজটেকরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। স্থানীয় মানুষগুলির ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ও খুনের ভয় দেখিয়ে স্প্যানিয়ার্ডরা জোর করে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। এই ভাবেই পনেরশো একুশ সালে অ্যাজটেক সভ্যতা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেয়।

সোকালো-র পিছনে ন্যাশনাল প্যালেস

বিকেল চারটের আগেই মেক্সিকো সিটিতে ঢুকে গেলাম আর সৌভাগ্যবশত যে হোটেলটি নেওয়া হয়েছিল তা 'সোকালো' নামে খ্যাত বিরাট ঐতিহাসিক স্কোয়ারটির পাশেই। মস্কোর রেড স্কোয়ার বা বেজিং-এর তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের মত মাথা-ঘোরানো না হলেও এটিও আয়তনে কিছু কম যায় না। দেখি দলে দলে বাচ্চা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আর কেউ-কেউবা শুধুই খেলে বেড়াচ্ছে। চার্চ, ন্যাশনাল প্যালেস, নামী-দামী রেষ্টুরেন্ট ও অ্যাজটেক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ঘেরা এই স্কোয়ারটিই মেক্সিকো সিটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এই দেশের বেশির ভাগ লোকজন নেটিভ হলেও অন্য দু'রকমের চেহারাও চোখে পড়ে। একটি ছোট গ্রুপ যারা এখনও খাঁটি ইউরোপীয়ান অর্থাৎ সাদা চামড়া আর একটি হল দুটির মিশ্রণে একটি দোআঁশলা গ্রুপ যাদের অনেককেই দেখতে আবার ভারতীয়দের মত। অতীতেও দেখেছি লোকজন আমাকে মেক্সিকান ভেবে স্প্যানিশে কথা শুরু করে দিত তাই এবারে 'ওলা' (হ্যালো), গ্রাসিয়াস্ (ধন্যবাদ)-এর সঙ্গে 'আমি আপনাদের ভাষা জানিনা'-টাও ঝাড়া মুখস্থ করে গিয়েছিলাম। এই সোকালোর খুব কাছেই 'বেলে আর্তে' মিউজিয়াম যেখানে ছবির প্রদর্শনী ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। প্রথমদিন সন্ধ্যাবেলাতেই আমরা সেখানে মেক্সিকান ফোকডান্স দেখতে গেলাম। ছেলেরা কেউ দেখি অ্যাজটেক স্টাইলে কোমরে ছাল জড়িয়ে মোষের শিং বাজিয়ে যাচ্ছে আর মেয়েরা কেউ-কেউ স্প্যানিশ স্টাইলে রংবেরং-এর ঘাঘরা পড়ে নেচে যাচ্ছে। এক কথায় দুটি সংস্কৃতির একটা খিচুড়ি ভার্সান।

টিয়োটি উয়াকান

পরের দিন তিরিশ মাইল দূরে 'টিয়োটি উয়াকান' অর্থাৎ ঈশ্বরদের জন্মস্থান নামে একটি জায়গাতে সান ও মুন পিরামিড দেখতে গেলাম। প্রায় দুহাজার বছর আগে নির্মিত এই পিরামিডগুলি ঠিক কোন ট্রাইবের লোকেরা বানিয়েছিল তা আজ কেউ জানে না। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখানে প্রচুর মৃতদেহ পেয়েছেন যার থেকে ধারণা করা হয় যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে এরা নরবলি দিত। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে উঠতে থাকলে তেষট্টি মিটার পর্যন্ত ওঠা যায়। শোনা যায় অতীতে এটি এক জমজমাট বড় জায়গা ছিল যেখানে প্রায় দেড়লক্ষ লোক বাস করত। কেন বা কি কারণে তারা এই জায়গাটিকে ছেড়ে চলে যায় তা আজও রহস্য।

সেদিন সন্ধেবেলা মেক্সিকো সিটিতে ফিরে সোকালোর আশেপাশে লোকজনকে রাস্তাতেই যেভাবে নাচগান করতে আর খেতে দেখলাম তাতে মনে হল মেক্সিকানরা বেশ ফুর্ত্তিতেই আছে। সেখানেই একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রেষ্টুরেন্টে 'এনচেলাডা'-র অর্ডার দিয়ে যে পদার্থটি পেলাম সেটি হল টমেটো সস্ ও চিজের ওপর ভাসমান কিছুটা ফালি করে কাটা অর্দ্ধ-কাঁচা মাংস। পান চিবানোর মত সেটিকে কিছুক্ষণ চিবানো গেলেও গলাদ্ধকরণ করা অসম্ভব। কি ভাগ্যি তার সাথে অ্যাজটেক স্যুপটির অর্ডার দিয়েছিলাম তাই সে যাত্রায় জোর বেঁচে গেলাম! নামটি ছাড়া আমেরিকার এনচালাডার সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই। এমনকি অ্যাজটেক নাম দিয়ে যে স্যুপটি সারা মেক্সিকো জুড়ে বিক্রি হয় তাদের প্রত্যেকেরই স্বাদ-গন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা, কমন শুধু একটাই - ওপরে কিছু ভাসমান ভুট্টার রুটির ছেঁড়া টুকরো।

টেম্পলো মেয়র

পরের দিন সোকালোতে ন্যাশনাল প্যালেস আর টেম্পলো মেয়র দেখতে গেলাম। এখানেই অ্যাজটেক রাজা মনটেজুমার বিশাল প্রাসাদ ছিল যাকে স্প্যানিয়ার্ডরা ধুলিস্যাৎ করে তারই ইট পাথর দিয়ে এই প্যালেসটিকে বানায়। কয়েকটি ঘর দর্শকদের জন্য খোলা থাকলেও বেশিরভাগটাই এখন সরকারি অফিস। এর পাশেই টেম্পলো মেয়র, যে অ্যাজটেক মন্দিরটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা কিছুটা মাটি খুঁড়ে বার করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমেই চোখে পড়ল একটি পাথরের সাপ যা কিনা প্রায় পুরো মন্দিরটাকেই পেঁচিয়ে রেখেছে আর চাতালের মধ্যিখানে একটি অর্দ্ধশোয়া মনুষ্যমূর্তি। এরা সাপ, বৃষ্টি ও সূর্যের পুজো ছাড়াও ভুট্টা গাছের পূজা করত - আজও সেটিই তাদের প্রধান খাদ্য। স্প্যানিয়ার্ডদের কাছে সাপ ছিল অত্যন্ত অশুভ, তাই এই নেটিভ মানুষগুলির মাথা থেকে সাপ দেবতাকে তাড়াতে তাদের প্রচন্ড বেগ পেতে হয়। এখনও মেক্সিকোতে বহু ট্রাইব সাপ ও বৃষ্টি

দেবতাদেরই পূজা করে। খেয়াল করে দেখবেন বিদেশি আর্যরা ভারতবর্ষে এসে তাদের দেবতাদের যতই জয়গান করুক না কেন এখনও ভারতবর্ষে ইন্দ্র-বরুণের বিরাট কদর নেই, লোকজন সেই ঘেঁটু-মনসার পুজোই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের হোটেলের ডোরম্যানটিকে জিজ্ঞাসা করতে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বলল, সে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসেছে। সেখানে তারা বাড়িতে নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে এবং বৃষ্টির দেবতা ছাড়াও তাদের আরও অনেক দেবতার পুজো করতে হয় কারণ তারা প্রত্যেকেই ডিভোটেড খ্রিস্টান। অবাক হয়ে বললাম– তাহলে তোমরা জেসাসকে ডাকো কখন? সে অম্লান বদনে বলল– 'ওর পুজো তো শুধু ডিসেম্বরে হয় যখন মেক্সিকো সিটি খুব সুন্দর করে আলো দিয়ে সাজানো হয় আর আমাদের ট্রাইবরা মুখে রং মেখে উঁচু কাঠের খুঁটি থেকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলে ও নেচে খ্রিস্টমাস সেলিব্রেট করে।' জানিনা কেন কথাটা শুনে বাংলার চড়কের মেলার কথা মনে পড়ে গেল।

চাপোটিপেক্ পার্ক - মেক্সিকোসিটি

পরেরদিন সকালে মাথা-খোলা ডবল ডেকার বাসে চেপে মেক্সিকোসিটি ঘুরতে ঘুরতে একসময় 'চাপোটিপেক্' পার্কের স্টপে নেমে পড়লাম। সতেরোশো একর জুড়ে ফুল, লেক ও বিভিন্ন স্ট্যাচু দিয়ে সাজানো এই সুন্দর পার্কটি অ্যাজটেকদের কাছে খুব পবিত্র জায়গা ছিল। এখানেই একটি জায়গায় বিরাট বড় মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচু আছে। দুটি মেয়ে পার্কে যথারীতি আমাকে মেক্সিকান মনে করে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতে এগিয়ে এল তাই অগত্যা পূর্ব-মুখস্থ লাইনটি গড় গড় করে আউড়ে গেলাম – 'নো আবলো এসপ্যানিয়ল'। তাতে ফল হল বিপরীত, স্প্যানিশ ভাষাতেই আমার মুখে আমি স্প্যানিশ জানি না শুনে তারা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল আর আমিও সেই সুযোগে হাঁটা দিলাম। এই পার্কেই একটি পাহাড়ের ওপর স্প্যানিয়ার্ডরা 'চাপোটিপেক্' ক্যাসেলটিকে বানায় যেখান থেকে পুরো মেক্সিকো শহরটাই পরিস্কার দেখা যায়।

মেক্সিকো শহর থেকে প্লেনে মাত্র একঘন্টা দুরে প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে আকাপুলকো যেখানে আমরা দিন তিনেকের জন্য গিয়েছিলাম। পাহাড় ও সমুদ্র মিলিয়ে এই সৈকতটি বড় সুন্দর তাতে আবার দূরে তাল ও নারকেল গাছের সারি। দেখলাম ভারতবর্ষের রেলস্টেশনে 'চায়ে গরম' 'চায়ে গরম'-এর মত হাঁক দিয়ে লোকজন 'তামালে' বিক্রি করছে। ছোট ছোট ভুট্টার রুটির মধ্যে বীন ও মাংসের পুর দিলে হয় নোনতা তামালে আর ভেতরে মিষ্টির পুর দিয়ে করলে মিষ্টি তামালে অর্থাৎ কখনও মাংসের রোল আর কখনও বা পাটিসাপটা। সমুদ্রের ধারে কেউ পুঁতির মালা বিক্রি করছে আর কেউ বা আমেরিকার সিকি ভাগ টাকায় ট্যুরিষ্টদের মাসাজ করে যাচ্ছে। তাদের গরিব বাচ্চারা ট্যুরিষ্টদের ফেলে দেওয়া কোল্ড ড্রিংকস-এর বোতলে বালি ও সমুদ্রের জল ভরে মহা ফুর্তিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছে যা দেখে মনে হল লেটেস্ট ভিডিও গেম হাতে নিঃসঙ্গ বড়লোক বাচ্চাদের থেকে এরা ঢের বেশি আনন্দে আছে। গরিব হবার আর একটা পজিটিভ দিকও দেখে এলাম– এখানে মায়েরা পয়সার অভাবে কোল্ডড্রিংকস-এর বদলে বাচ্চাদের তুলনায় সস্তার ডাবের জল খাওয়াচ্ছে। আকাপুলকো থেকে ফিরে মেক্সিকোসিটির সোকালোকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। সেই বিশাল স্কোয়ারটি চতুর্দিকে ফ্ল্যাড লাইটের আলোতে একেবারে ঝলমল করছে আর তার মধ্যিখানে বসানো একটি তিনতলা বাড়ির সমান প্লাস্টিকের মড়ার খুলি, তাকে ঘিরে আবার কয়েকশো বন্দুকধারী পুলিশ। মড়ার খুলির এহেন প্রোটেকশন দেখে অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো 'জানো না আজ রাতে জেমস বন্ড আসছে এখানে শুটিং করতে'? আমার কপাল মন্দ, বহুরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেও 'ডবল ও সেভেনের' দর্শন না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

রাজা মনটেজুমার প্রাসাদের মডেল

শেষ দিনটি রেখেছিলাম বিখ্যাত অ্যানথ্রোপলজি মিউজিয়মের জন্য। সবই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা তাই একটি ইংলিশ গাইডের সাহায্য নিতে হল। বিভিন্ন দেবতার জেডপাথরের তৈরি মূর্তি চোখে পড়ল। জেডপাথর অ্যাজটেকরা কিনে আনত গুয়েতেমালা অঞ্চল থেকে। মূর্তিদের অনেকের গলাতেই ঝুলছে মানুষের দাঁত দিয়ে তৈরি হার। অনেক হাঁটু মোড়া নরকঙ্কালও দেখতে পেলাম, লম্বা হবার দরুন স্থানাভাবে তাদের সেইভাবে জীবিত অবস্থাতেই সমাধি দেওয়া হয়। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এদের নৃশংসভাবেই হত্যা করা হত। ভাবতে হাসি পেলেও অ্যাজটেকদের কিন্তু সত্যিই আঠারো মাসে বছর হত। প্রতিটি মাসের জন্য বরাদ্দ ছিল কুড়িটি দিন এবং একটি করে দেবতা। আপনি যে মাসে জন্মাবেন সেই মাসের বিশেষ দেবতাটি আপনাকে সবসময় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। অ্যাজটেকরা যদিও বিলক্ষণ জানত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হয়, তাই তিনশো ষাট দিনের পর ওই বাড়তি পাঁচদিনকে কোন মাসের মধ্যেই ঢোকাতে না পেরে ওগুলিকে অশুভ বলে শুণ্যে ঝুলিয়ে রাখত। তাহলে কারুর জন্ম যদি ওই বাড়তি পাঁচদিনের মধ্যে হয় তার কি দশা হবে? কি আর হবে সেও অশুভ হয়ে ঝুলে থাকবে কারণ কোনও বিশেষ দেবতার আওতাতেই না পড়ায় কেউই তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। শুধু তাই নয়, এখনকার দিনের মত ছেলেমেয়েদের যে বাহারি নাম রাখবেন তখন কিন্তু সে বালাই ছিল না। প্রতি ঘন্টার জন্য একটি করে ছবি আঁকা থাকত অর্থাৎ বেলা একটায় জন্ম হলে ঘড়ির ছবির সঙ্গে মিলিয়ে যতজন সেইসময়ে জন্মাবে তাদের সবাইকেই একই নামেই ডাকা হবে। কী ভাগ্যিস সেই সময়ে জনসংখ্যা বেশি ছিলনা তাই বাঁচোয়া, এখনকার দিন হলে আর দেখতে হত না।

মিউজিয়াম থেকে ফেরার পথে দেখি পার্কে বেশ কিছু মেক্সিকান শরীরটাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে চিনে 'তাইচি' চর্চা করে যাচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখেও সেখানে একটি চিনে চোখে পড়ল না। এযুগে অবশ্য আর কিছুতেই আশ্চর্য হই না। সেদিন সকালেই দেখেছি প্রাতরাশের সময়

এক জার্মান ট্যুরিষ্ট ডিমভাজার ওপর প্রচুর পরিমাণে সাংঘাতিক ঝাল মেক্সিকান লংকা ছড়িয়ে অম্লানবদনে মুখে পুরছেন। বেজিং-এ গিয়ে দেখেছিলাম মেরি, জুলি ও বব নামধারী চৈনিক ছেলেমেয়ের দল পূর্ণউদ্যমে হ্যামবার্গার চিবিয়ে যাচ্ছে আর লন্ডনে ইংলিশম্যানরা অনেকেই ফিস্ এন্ড চিপস্ ছেড়ে গরম গরম সামোসা ধরেছেন। আধুনিক জাপানি ছেলেমেয়েরা আবার কাঠি ধরতে পারেন না বলে কাঁটা দিয়ে নুডলস্ তুলছেন কিন্তু তাই বলে ভুলেও মনে করবেন না কাঠি-সংস্কৃতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হতে বসেছে কারণ বহু আমেরিকান সাহেব সেটিকে ঠিকই ধরে রেখেছেন। তেনারা সাধুবাবাদের মতন যোগব্যায়াম সেরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে নুডলস্ তো নুডলস্ মায় ক্ষুদ্র চিনেবাদাম পর্যন্ত খপ করে কাঠি দিয়ে ধরে টপ করে মুখে ফেলেছেন। ভেবে লাভ নেই, বিশ্বায়নের যুগে এখন গোটা বিশ্বজুড়েই গোলমাল।

মেক্সিকো ছাড়ার সময় হয়ে এল কিন্তু কিডন্যাপার বা ড্রাগলর্ডদের দর্শন পাওয়া তো দূরের থাক শেষমুহূর্তে এসে জেমস বন্ডও হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেল শুধু একটি বড়সড় মড়ার খুলি দেখাই সার হল তাও কিনা প্লাস্টিকের! নিদেন পক্ষে ভিড় ট্রেনে উঠে 'পকেটমার হইতে সাবধান' কথাটিও যে আপনাদের কাছে ফলাও করে জানাব সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলাম কারণ পকেটের জিনিস ইনট্যাক্ট পকেটেই থেকে গেল। 'চক্ষুদান'-এর পরিবর্তে লোকজন বরং উঠে দাঁড়িয়ে আমাকেই বসার জায়গা করে দিল। চাঞ্চল্যকর কোনও ঘটনার সম্মুখীন না হলেও বলব আমার কিন্তু মেক্সিকোদর্শন বৃথা যায় নি। চতুর্দিকে সরল মানুষগুলির নাচ দেখে, ফুটপাথে তামালে খেয়ে, অ্যাজটেকদের মন্দির দর্শন করে বা আকাপুলকোতে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে গা ভাসিয়ে আমাদের সময়টা কিন্তু খুব ভালোই কেটেছে। রাস্তাঘাটে সস্তার কাঠের লাট্টু ও ঘুড়ি হাতে গরিব বাচ্চাদের খুশিতে উপচে-পড়া মুখগুলো দেখে কিছুক্ষণের জন্যও যেন নিজের ছোটবেলার দিনগুলিকে ফিরে পেয়েছিলাম।

মেক্সিকো সিটিকে বিদায় জানানোর আগে শেষবারের মত সোকালোর দিকে তাকিয়ে মানসপটে যেন ভেসে উঠেছিল একটি বিষণ্ণ রাজার মুখ। অশ্রুভরা চোখে রাজা মনটেজুমা যেন তার প্রজাদের বলছে– "তোমরা ক্ষমা কোরো আমায়। আমি পারলাম না এই সভ্যতার মুখোস-আঁটা বর্বর বিদেশি মানুষগুলির হাত থেকে তোমাদের আদরের টিনোশটিটলানকে রক্ষা করতে। তাই আমার সাথে সাথেই পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে গেল একদা ঐতিহ্যময় অ্যাজটেক সভ্যতা।"

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আকাপুলকো সৈকত

~ মেক্সিকোর আরও ছবি ~

শ্রাবণী ব্যানার্জির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীত ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে সারা বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বন্য আফ্রিকায়

অরীন্দ্র দে

~ আফ্রিকার আরও ছবি ~

আমাদের ছোটবেলায় ধর্মতলার সিনেমা হলগুলোতে শুধু ইংরেজি সিনেমাই দেখানো হত। সম্ভবত সেইজন্যেই আমবাঙালি ওই হলগুলোয় ঢুকতে কিঞ্চিৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। আমার সাহেবি মনোভাবাপন্ন বাবার সঙ্গে 'টুথ এন্ড ক্লু' বলে একটা সিনেমা দেখেছিলাম। তখন থেকেই আফ্রিকা, বিশেষত পূর্ব আফ্রিকা আমার স্বপ্নের দেশ। অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে জানি পূর্ব আফ্রিকা মানেই দারিদ্র্য, দুর্নীতি, ভঙ্গুর আইন শৃঙ্খলা। তবু এ সবের মধ্যেই, বাঁচার আনন্দে, কৃষি আর পর্যটনকে ধরে বেঁচে থাকা। কেনিয়া বা মোজাম্বিকে চলতে ফিরতে রাস্তা ঘাটে যখন তখন ছিনতাই হবার প্রভূত সম্ভাবনা, সম্ভাবনা পুলিশের হাতে পর্যটকদের হেনস্থা হওয়ার। স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রায় কেমন যেন একটা হচ্ছে হবে, হলেও হয়, না হলেও ক্ষতি নেই ভাব। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে দরকার বিনিয়োগ, কিন্তু কেই বা তা আনে!
তবু..... আমরা দশজনে পথে, অথবা আকাশেও বলতে পারেন - গন্তব্য কেনিয়ার নাকুরু হ্রদ, মাসাইমারা আর আম্বসেলি, আর তানজানিয়ার ঙ্গুরুগুরু।

১০ অগস্ট ২০১৩, মুম্বাই থেকে নাইরোবি। পৌঁছেই সটান নাকুরু হ্রদ, মোটে পাঁচ ঘণ্টার পথ। উদ্দেশ্য ফ্লেমিঙ্গো, পেলিক্যান, স্টর্ক, বক আর গণ্ডার, সিংহ, মোষ, বেবুন দেখা। অবস্থিতি পার্কের মধ্যের একমাত্র হোটেলে, নাকুরু গেস্ট হাউসে। সেখান থেকে মাসাইমারা, আমাদের মূল দ্রষ্টব্য। নারোক শহর পেরিয়ে মোটে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ। সেখানে দেড় দিনের দুর্দান্ত সাফারি। আমাদের জঙ্গলের ধারণার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মেলে না, প্রায় ফাঁকা মাঠ, মধ্যে মধ্যে মাথা তুলে জেগে থাকা দুয়েকটি গাছ; তাও সে আমাদের চেনা মহীরুহসদৃশ নয়। তবু চোখ জুড়োয়। মাসাই উপজাতি এই জঙ্গলের মালিক, আর সেই থেকেই মাসাইমারা নাম। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাসাইদের গ্রাম। মাসাইদের সমৃদ্ধি তথা সামাজিক অবস্থান নির্ভর করে কার কটা গরু তাই দেখে। বন্যপ্রাণও ছড়িয়ে ছিটিয়ে - অজস্র। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি অবস্থা! সিংহ-চিতা-মোষ-বেবুন-বাইসন-জেব্রা-জিরাফ-জলহস্তী-উটপাখি... আর পাখির তো কোন সীমা পরিসীমা নেই।

এর মধ্যেই একজন তো ডেকে নিয়ে গিয়ে গায়ে পড়ে ব্ল্যাক মাম্বা (Dendroaspis polylepis), বিশ্বের দীর্ঘতম বিষধর প্রজাতির সাপ, দেখিয়ে দিল। আমাদেরটা ফুট সাতেকের ছিল, তবে নাকি এর চেয়েও লম্বা হয়। আর নাম ব্ল্যাক মাম্বা হলেও এর রং মোটেই কালো নয়, বরং সবজেটে বাদামি বললে কাছাকাছি আসে। এর মুখগহ্বর আলকাতরার মত কালো, আর তাই থেকেই এই নাম।

তবে এখানকার প্রধান আকর্ষণ পশুপক্ষীর মাইগ্রেশন। দলে দলে প্রাণীরা তানজানিয়ার দিক থেকে এসে মারা নদী পেরিয়ে এই জঙ্গলে ঢোকে; একমাস পরে ওইপথেই ফিরে যায়। তাই জুলাই অগস্ট এই অরণ্যে দর্শনার্থীদের জন্য মধুমাস। শীতকাল শেষ, তবু সকাল সন্ধ্যা হিমঠাণ্ডা, বাতাসে কাঁপুনি। আর দুপুরগুলোয় সূর্যের অকৃপণ দাক্ষিণ্য যেন জ্বালিয়ে দেয় মাঠঘাট। দুরাত সেখানে কাটিয়ে আম্বোসেলি, দশ ঘণ্টার পথ। সেখানেও দুরাত, কিবো সাফারি ক্যাম্পে;পটভূমিতে হেমিংওয়ের মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। আম্বোসেলির খ্যাতি প্রধানত হাতিতে, সঙ্গে চিতা, জিরাফ আর উটপাখি। আফ্রিকার হাতি (African bush elephant, Loxodonta Africana) আমাদের ভারতীয় হাতি (Asiatic elephant: Elephas maximus) র চেয়ে আকারে বড় এবং দুর্বিনীত, এরা পোষ মানে না। কপাল ভালো থাকলে হোটেলে বসেই হস্তীদর্শন হতে পারে, নচেৎ জঙ্গলের মধ্যে টিলার ওপরে ভিউপয়েন্টে।

শেষ গন্তব্য তানজানিয়ার ঙ্গুরুগুরু, নাইরোবি থেকে তিন ঘণ্টায় নামাঙ্গা, সীমান্ত পেরিয়ে গাড়ি বদলিয়ে ঙ্গুরুগুরু আরও চার ঘণ্টার পথ। Ngorongoro Conservation Area (NCA) ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। তার মধ্যে দিয়েই সাফারির গমনপথ। ফ্লেমিঙ্গো,সিংহ, উটপাখি, হায়না অধ্যুষিত। আমরা ছিলাম ওয়াইল্ড লাইফ লজ-এ, জ্বালামুখের গায়েই। সেখান থেকে নাইরোবি হয়ে মুম্বাই, স্মৃতির ঝুড়ি বয়ে।

~ আফ্রিকার আরও ছবি ~

ভ্রমণ শুধুমাত্র নেশা বা ভালোলাগা নয়, ওইটাই জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী অরীন্দ্র দে-র কাছে। ভালোবাসেন পাহাড়ে চড়তেও। একাধিক হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মাউন্ট ভাগিরথী-(২) সফল অভিযানটির সদস্য ছিলেন। ছবি তুলতে ভালোবাসেন। স্বপ্ন দেখেন জীবনে একটারাত অন্তত স্পেস স্টেশনে কাটানোর।

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

ঈশ্বরের চিত্রপট তাকদায়

উদয়ন লাহিড়ি

~ তাকদা-র আরও ছবি ~

তিস্তা বাজারের রাস্তা ধরে পৌঁছালাম পেশক। পেশক থেকে তিনচুলে প্রায় দশ কিলোমিটার আর তাকদা তিন। তাকদা আসলে একটা ছোট পাহাড়ি শহর। উচ্চতা হাজার পাঁচেক ফিট। মেন রোড থেকে পাথরের খাড়া রাস্তা উঠে গেছে সাইনো হেরিটেজ বাংলোতে। শেষ অংশ ওই পাথরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে উঠতে হবে। তবে সেটা একটুখানিই তাই রক্ষা। ঝকঝকে পরিষ্কার ঘন নীল আকাশ। মনটাও সেরকমই ভালো হয়ে গেল।
কিছুদিন আগেই লেপচাজগত ঘুরে এলাম টোটাল সাড়ে তিন হাজার টাকায়। এহেন আমি কিনা তাকদা এসেছি ইনোভাতে চড়ে! আসলে এবার ফ্যামিলি সঙ্গে আছে। সামনে একটা লন। সেখানে সাইনো পরিবারের দুটি পোষা সারমেয়। একটার নাম বেটা, আর একজন সিম্বা। আমাদের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল ওদের। আমরা যেখানে বসছি ওরাও সেখানেই বসে থাকছে। মাঝেমধ্যেই বিস্কুট খাচ্ছে। এই বাংলোটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি। আন্তর্জাল তথ্য বলছে, ১৯১৫ সালে। সাইনোর বাসিন্দাদের মতে এটা তৈরি হয়েছিল ১৯০৮ সালে। সাইনো বাংলোর মালিক বর্তমানে মোকতান পরিবার। এনাদের আন্তরিকতার কথা ভোলা যায় না। আনন্দ মোকতান সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। থাকেন কার্শিয়াঙে। কিছুদিন হল এটা চালু করেছেন। একটা নতুন ঘর করেছেন বাংলোর লাগোয়া। সেখানেই আমাদের ঠাঁই হল। পুরোনো বাংলোয় দুটো ঘর আর বাড়তি দুটো ঘর, এই চারটে ঘর ভাড়া দেন। বাংলোতে থাকেন আনন্দ মকানের বয়স্ক বাবা ও বৃদ্ধা মা। দুজনেই এখনও যথেষ্ট কর্মশীল। আর থাকেন আনন্দ মোকতানের বোন। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত প্রধান অতিথিদের দেখভাল করেন। ওঁদের ছোট্ট মেয়ে ভূমিশ্রী। এখানে খাবারও খুব ভালো। যত্ন নিয়ে খাওয়ানও বটে। কুক যুবরাজ আর সুরজকে বলতে বাধ্যই হয়েছিলাম যে আমাদের অর্ধেক পরিমাণ খাবার দিতে। খেয়ে শেষ করে উঠতে পারছিনা আর সেটা ফেলা যাচ্ছে। বড্ড খারাপ লাগে খাবার নষ্ট করতে।

সাইনো বাংলোর ঠিক ওপরেই তাকদা মনাস্ট্রি। বহু প্রাচীন গুম্ফা। অদ্ভুত লাগল যে বুদ্ধের মূর্তির সামনে রাম, হুইস্কি, ভ্যাট ৬৯ এই সবের বোতল রাখা। মানেটা বুঝলাম না। ছবি তোলা বারণ কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে ছবি তুললে জীবনীশক্তি হ্রাস হয়। ফেলু মিত্তিরের গ্যাংটকে গণ্ডগোলেও তাই পড়েছিলাম। একসময় এই অঞ্চলটি ছিল ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট। তাবড় তাবড় মিলিটারি অফিসারেরা আসতেন এখানে। তাদের জন্য তৈরি হয়েছিল বড় বড়ো বিলাসবহুল ব্রিটিশ বাংলো। সেগুলির আজ হয় ভগ্নদশা, নাহয় স্কুল বা চার্চ হয়ে গেছে। মনাস্ট্রি দেখে চললাম এরকমই একটি বাড়ি রানিকুঠি দেখতে। রানিকুঠি বর্তমানে চার্চ। পরবর্তী গন্তব্য অর্কিড হাউসটা নাকি পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। অনেক বিদেশি পর্যটক আসত এর টানে। তাকদা বাজার থেকে আধা কিলোমিটার দূরে। গোর্খা আন্দোলনের সময় ভেঙে দিয়েছিল। এখন আবার সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে।
ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল। যখন ফিরলাম দেখলাম রাস্তায় অধিকাংশের নেশাতুর অবস্থা। একটু ভয়ও পাচ্ছিলাম। এদিকে বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। চায়ের খুব দরকার।
সাইনো বাংলোতে আলো জ্বালানো হয়েছে। তাতে আরও অভিজাত রূপ নিয়েছে আমাদের আজকের রাতের ঠিকানা। ঠাণ্ডাটা চামড়া ভেদ করে এবার হাড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। গজল চলছে – জগজিৎ সিং। সামনের লনটায় এসে বসলাম। নিরাবরণ আকাশে কত যে তারা! হাতের চা-টা হাতেই ধরা রইল। কোন নীহারিকায় চলে গেলাম কে জানে! আমি এখন জ্যোতির্বিদ। কালপুরুষ,সপ্তর্ষিমণ্ডল এসব যেন আমার কতদিনের চর্চা। বাকি অর্ধেক চাঁদটি আজ খুব দরকার ছিল।

যুবরাজ খেতে ডাকছে। ভাবলাম, খেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়ে আবার এসে বসব। খেয়ে দেয়ে বিছানায় লেপটা চাপা দেবার পর আর কিচ্ছু মনে নেই। ঘুমটা ভাঙল আঙ্কলের (আনন্দ মোকতানের বাবা) ডাকে। তখনও বাইরে অন্ধকার। কটা বাজে কে জানে! সূর্যোদয় দেখা যায় এখান থেকে। ঠিক পেছনেই টাইগার হিল। তবে অনেকটা ওপরে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা অবরুদ্ধ। তাছাড়া বাকি সব টাইগার হিলের সমান। সূর্যোদয়ের বর্ণনা দেওয়া সাহসে কুলাল না। আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে গেলাম। আশেপাশে ঘুরে দেখব। সারথি হিসেবে আজ পেলাম এনাসকে। নটার মধ্যে সুমো নিয়ে এসে গেল। প্রথমেই এলাম রংলি রংলিওট চা বাগান। এটার বিস্তার বিশাল। তাকদা মনাস্ট্রি থেকে কাল এটাকেই দেখেছিলাম। এরপর গিল চা বাগান। এটাও বেশ বড়। তারপরের রাস্তা আর বুঝতে পারলাম না। এনাস এক জায়গায় নিয়ে এল। এখান থেকে পাথুরে রাস্তায় খানিক নীচে নেমে হ্যাঙ্গিং ব্রীজ। ইস্পাতের দড়ির ওপর ঝুলছে। নীচে কাঠের বাটাম। দুলছে পুলটা। দুই মেয়েকে চেপে ধরে আস্তে পেরোলাম। পুলের মাঝখানে দুই দিকের দৃশ্যপট অসাধারণ। এটাও নাকি ব্রিটিশদের তৈরি। তবে বুঝলাম যত্নের অভাবে আর কালের প্রভাবে আর বোধহয় বেশিদিন আয়ু নেই।

এরপর আমরা যাব তিস্তা ভ্যালি চা বাগান। পিচ রাস্তা দিয়ে খানিক যেতে যেতে গাড়ির চাকা বাঁ দিকে ঘুরতেই শুরু হল সবুজের গালিচা। দুই দিকে চা বাগান। আকাশ নীল - নীলের সঙ্গে হলুদের মিশ্রণ। সে ভারি অদ্ভুত রঙ। তেমন রঙের দেখা কচিৎ কখনও পাওয়া যায়। আকাশ যে এতো নীল হয় তা যেন আগে আমার ধারনাই ছিলনা। দুদিকে চা বাগানের মাঝখান দিয়ে চলেছি। আমি এখন ধনরাজ তামাং। মাথায় হাত চলে গেল, তিন কোনা টুপিটা সোজা করব বলে। খেয়াল হল তামাং-এর টুপিটা তো নেই। কোথায় যেন খুব খারাপ লাগল। মনে হল আমি এখানকার কেউ নই। সাময়িক বাসিন্দা মাত্র। এই স্থান আমার নয়। যাকগে, তবুও এই কটা দিনের জন্য তো আমার। সেটাই চুটিয়ে উপভোগ করিনা কেন। পরকে আপন করাটাও তো ভ্রমণের উদ্দেশ্য। এই সব ভাবতে ভাবতেই বুঝলাম রাস্তা বেশ ক্ষীণকায় আর পাথুরে। বেশ খানিকটা চলার পর এনাস এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। পাহাড়ের দুই ঢালে গালিচা। ওপরে ঘন নীল। মাঝখান দিয়ে হলুদ পথ চলে গেছে কোনো এক ভিউ পয়েন্টের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে সেদিকেই পা বাড়ালাম। পেছন থেকে এনাসের কণ্ঠধ্বনি ভেসে এল "বহুত বড়িয়া ভিউ।"

ভিউ পয়েন্টটা চারটে সিঁড়ির ওপরে। ওপরে উঠে সত্যি হতবাক হয়ে গেলাম। পর্বতবহুল এক দৃশ্যপটে মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। নীল পর্বতের মাঝে সবুজবর্ণ জলধি। জলরঙে বড় কোনও পেন্টিং। ঈশ্বরের চিত্রপট। এই সময়েও ঘড়ির কাঁটা থামার কোনো লক্ষণই নেই। অগত্যা ফিরে চললাম। গাড়িতে উঠেও বসলাম। মন কিন্তু ভরল না। ইচ্ছা করছে এইখানে বসেই কাটিয়ে দিই সারাটা জীবন।

গাড়িটা এগিয়ে চলেছে বড়া মাঙ্গোয়ার দিকে। প্রথমে পড়বে ছোটা মাঙ্গোয়া। তারপর বড়া মাঙ্গোয়া। খুব ধীর গতিতে চলেছি আমরা। কারণ রাস্তার চামড়া তো খসে গেছেই, হাড়গোড়গুলোও আর কিছু নেই। এহেন হাড়-জিরজিরে রাস্তা দিয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার পেরিয়ে বড়া মাঙ্গোয়া অরগানিক বাগান। ঢুকতে ত্রিশ টাকা লাগবে প্রতি জন। অসংখ্য গাছ চিনলাম। নামগুলো জানতাম কিন্তু কীরকম দেখতে তা জানতাম না। ফার্ন, রুদ্রাক্ষ, তেজপাতা, দারচিনি, কমলালেবু, গন্ধলেবু, পেয়ারা। ভেতরে দুটো মেডিটেশন সেন্টারও আছে। ওদের একটা দোকানও আছে। সেখানে অরেঞ্জ স্কোয়াশ, ভিনেগার, অরেঞ্জ পীল পাউডার এইসব কমদামে পাওয়া যায়।

এবার ফেরার পালা। এ পথে তিনচুলের গুম্বাদাঁড়া ভিউ পয়েন্টে আর দাঁড়ালাম না। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। বিকেলের দিকে আকাশে মেঘের আনাগোনা। মোকতান পরিবারের কাছে শুনলাম ওঁরা এখান থেকে একটা ট্রেকের ব্যবস্থাও করেন। ডে-হাইকিং বলা যেতে পারে। ছয় কিলোমিটার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লামাহাটা, আবার ফিরে আসা। অদ্য এই বাংলোতে শেষ রজনী। দুটো দিনেই যে পিছুটান তৈরি হয় এই প্রথম জানলাম।

~ তাকদা-র আরও ছবি ~

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কর্মরত উদয়ন লাহিড়ি অবসর পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

পূবারের সোনালি তটে

অনুভব ঘোষ

~ কেরালার আরও ছবি ~

অন্যরকম কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল দুজনেরই। আর ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে নির্জন ভ্রমণ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিনও নয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস। ঠাণ্ডার আমেজ গায়ে মেখে মধুচন্দ্রিমা যাপনে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গন্তব্য কেরালার বিখ্যাত ব্যাকওয়াটার। তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলাম অচেনা, নির্জন পূবার। কোভালাম সৈকতের খানিক দূরে তিরুভনন্তপুরমের কাছে মনোরম সৌন্দর্যের পূবার (Poovar)। সবুজ স্থলভূমি, নারকেল গাছের সারি, ব্যাকওয়াটার ভ্রমণ, আরবসাগরের ঢেউ সবই আছে পূবারে। কেরালা বেড়ানোর আদর্শ সময়ও ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ জানুয়ারি সকাল সাতটা নাগাদ লাইট হাউস বিচ ধরে হেঁটে গিয়ে হাওয়া বিচের কাছ থেকে অটো নিলাম পূবার যাওয়ার জন্য। দরাদরি করে রফা হলো চারশো টাকায় পূবার ঘুরিয়ে আবার বিচে ফিরিয়ে আনবে। দূরত্ব বিশ কিমির মধ্যে, মিনিট পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ সময় লাগল। আটটা নাগাদ অটো এসে দাঁড় করালো সবুজে মোড়া একটা জায়গায়, সামনে বড় ঝিল মতন আর একটা রেস্টুরেন্ট। একজন লোক এসে কথা বলে গেল ব্যাকওয়াটারে ঘোরার বিভিন্ন প্যাকেজ নিয়ে। সবচেয়ে কম তিন হাজার টাকায় এক ঘণ্টা পূবার ব্যাকওয়াটারে ও বিচে ঘোরা, সেটাতেই রাজি হলাম।

একটি ছোট মোটর বোটে আমরা দুজনে আর চালক, সে-ই গাইড। আমাদের ভাগ্য ভালো থাকায় নেপালি চালক পেয়েছিলাম, তাই হিন্দি কথা বুঝতে ও বলতে সুবিধা হয়েছিল। মোটরবোট সবুজ গাছে ভরা ঝিল থেকে সরু সরু আঁকা বাঁকা গলিপথে ঢুকে পড়ল। ঠিক বড় রাস্তার পাশে সরু গলির মতো। তবে পার্থক্য অনেক, দুপাশে বাড়ির বদলে সারি সারি গাছ যার মধ্যে বেশিরভাগই নারকেল। কোলাহলমুক্ত, শান্ত-স্থির জায়গা। যেখানে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় শুধুমাত্র পাখির ডাকে। মোটর বোটও খুব ধীরে চলে ঢুকে পড়ল আরও একটু ভিতরে, এখন আর শুধু দুপাশ নয় মাথার ওপরও গাছের ছায়ায়। যেন অন্ধকার দিয়ে চলেছি। গাঢ় সবুজ রঙ এখানে কালো অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আসা সূর্যের রশ্মি যেন আমাদের ছুঁয়ে দেখছে। সেই গাঢ় অন্ধকার গাছে ঘেরা জায়গা থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে আলো। যেন আমরা পাথরের বদলে গাছের গুহা থেকে আলোর দিশা দেখে বেরিয়ে আসছি। আমাদের বোটের ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নৌকায় ডাব বিক্রি চলছে। সে যেন একটা রঙিন ক্যানভাস ফুটে উঠেছে। মুগ্ধতা ধরে রাখতে কেবলই ছবি তুলে যাচ্ছিলাম।

ধীরে ধীরে সেই সজীব প্রাকৃতিক সবুজ গুহা থেকে বোট বেরিয়ে এসে উপস্থিত হলো বেশ উন্মুক্ত স্থানে। যার বাঁদিক এবং সামনেটা নারকেল গাছের সারিতে ভরা আর ডানদিকে খোলা মাঠ মতন। সেই নারকেল গাছের সামনেই একজন আবার জালে করে মাছ ধরছে আর একটি সারস তার শিকারের অপেক্ষায়। এরপর বোট একটু দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল। বাঁদিকে একটা বাঁক নিতেই চমক দেওয়ার মতো দৃশ্য। সামনেই খোলা বিস্তৃত শান্ত জলরাশির দুপাশেই নারকেল গাছের সারি, জানা-অজানা পাখির ভীড়। এরমধ্যে পানকৌড়ি আর সারসের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। একটু দূরেই গাঢ় নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে কেরালার একমাত্র স্বর্ণাভ বালুকাময় সমুদ্রতীরে (Golden Sands Beach)। বাঁদিকে নারকেল গাছের সারি আর ব্যাকওয়াটারের মধ্যে রয়েছে পূবার আইল্যান্ড রিসর্ট। কটেজগুলি ভীষণ সুন্দর দেখতে এবং তারা ওই ব্যাকওয়াটারেই ভাসমান। আরো কিছু ভাসমান রেস্টুরেন্টও আছে যেখানে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে, আমাদের হাতে সময় কম থাকায় সে সৌভাগ্য হয়নি। এই ব্যাকওয়াটার আর সমুদ্রের মাঝে বাঁধ হিসেবে রয়েছে স্বর্ণাভ সমুদ্রতীর।

চড়ায় বোট থেকে নেমে আমরা পূবার বিচে হাঁটতে শুরু করলাম সমুদ্র অভিমুখে। এখানে সমুদ্র গাঢ় নীল। ঢেউয়ের উচ্চতা অনেক বেশি কোভালামের চেয়েও। সেই বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে সাদা ফেনার মতো হয়ে ছিটকে পড়ছে সমুদ্রতীরে। এই জায়গা যে সার্ফিং-এর জন্য আর্দশ কয়েকজনকে তা করতে দেখেই বোঝা গেল। বেশ দূরে কোনও শ্যুটিং চলছিল। সত্যিই অসম্ভব সুন্দর পরিবেশ। সামনে নীল আরবসাগর, পায়ের তলায় স্বর্ণাভ বালুরাশি, পিছনে ঘন সবুজে মোড়া পূবার ব্যাকওয়াটার।

সময় না থাকায় মনের আর হাতের ক্যামেরায় অনেক ফ্রেম বন্দি করে উঠে পড়লাম বোটে। আরও একটু ব্যাকওয়াটারে ঘুরে ফেরত চলে এলাম। ফেলে এলাম প্রকৃতির আঁকা ক্যানভাস। স্মৃতিতে রেখে দিলাম সেই ক্যানভাসে আঁকা ছবিগুলি। মনে মনে বললাম, পূবার, আবার আসব।

~ কেরালার আরও ছবি ~

তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানিতে কর্মরত অনুভব ঘোষের শখ ফটোগ্রাফি এবং ভ্রমণ। অবসর সময়ে ভ্রমণ ও সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে লেখালেখি করেন। তবে এই প্রথম কোনও পত্রিকায় লেখা পাঠানো।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher